পূর্ব সীমান্ত

মন্মথ রায়

সাহিত্য ব্রতী
১৯ই, সিমলাই পাড়া লেন, কলিকাতা-২

চার টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

মার্চ্চ, ১৯৩৪

সাহিত্য ব্রতী, ১৯ই, সিমলাইপাড়া লেন, কলিকাতা-২ হইতে শ্রীকালীপদ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ অ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স, ৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

ওরা কেউ ঘরে ফিরেছে, কেউ ফেরে নি,

কোনোদিন ফিরবেও না—

তবু স্মৃতিপথে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে।

লাইন পড়েছে।

টেবিলের উপর এক ডেকচি ডাল। পাশে স্তূপীকৃত রুটি। পিছনে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে হেডকুক।

প্রত্যেকেই কথা বলছে। মৃদু কলরবে গমগম করছে ছোট হলটা।

সেই খোসাসমেত উরুদ ডাল। তিনদিন ধরে চলছে। আধপোয়া হলুদ-লঙ্কা এবং ধূলি-বালি সহযোগে অপূর্ব কৃষ্ণবর্ণ। রাঁধুনীর হাতের গুণে জল, খোসা, ফোড়নের কাঁচা ভইসা-ঘি সমস্তই স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিরাজমান।

সকালবেলা এক কাপ চা খেয়ে এক ঘণ্টা পি.টি., দুঘণ্টা প্যারেড। ফিরে পেটের নাড়ি টনটন করে। আহার্য ঐ অপূর্ব ডাল আর কড়কড়ে রুটি।

খাবে কি! তার আগেই চোখে জল আসে। ক্যান্টিনে আজ পিঁয়াজ বাড়ন্ত।

প্রদ্যুম্ন চারদিকে তাকায় একফালি পিঁয়াজের জন্য। রোজ ক্যান্টিন থেকে নিয়ে আসে।

সকলকে ছাপিয়ে ওঠে সুব্রতর কণ্ঠ—দে, আরও ডাল দে। দেড় হাতা ডালে বারোখানা রুটী খাওয়া যায় না।

—এইটুকুও রেশনে আসে না।

—রাখ তোর রেশনের বাপের পিণ্ডি। দিবি দে—না হয় ঢেলে নেব।

—সাবধান, গালি দেবেন না।

—গালি দেব না, তোকে চুমু খাব। মন খুলে দে দিকিন বাপু।

—আপনি একেলাই খানেওয়ালা। কম পড়লে কে দেখে?

—চুপ কর। দিবি?—না, হাত লাগাব?

অত্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবে একহাতা ডাল সুব্রতর রেশন-টিনে ফেলে দেয়।

—মুখখানা দেখ না! শালা যেন ভিক্ষে দিচ্ছে।—ফোড়ন কাটে অপরটি।

সুব্রতর ফরসা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। লাইন থেকে বেরিয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে খেতে বসে।

—হাত গুটিয়ে কি তপস্যা করছিস প্রদ্যুম্ন ?—পুলিন ঠাট্টা করে।

—দেখছি, এক-আধটুকুরো পিঁয়াজ যদি কারো কাছে পাওয়া যায়।

উনুনের কাছেই গাদা দিয়ে রাখা আছে আলু পিঁয়াজ ধুঁধুল। পৃথ্বীশ অঙ্গুলি নির্দেশ করে—ঐ তো রয়েছে।

—দেবে কচুপোড়া। উল্টে খিস্তি শোনাবে।

—শোনালেই হল! মাথা পিছু রোজ চার আউন্স পেঁয়াজ। আমাদের রেশন আমরা পাই নে, অথচ যায় কোথায় ?

—যায় ক্যান্টিনে। রোজ কিনে আনিস, বুঝতে পারিস নে ?—মন্তব্য করে অনাদি।

—তুই চা গিয়ে প্রদ্যুম্ন।—সুব্রত যেন হুকুম করে।

—দেবে, তুই ক্ষেপেছিস !

—আপোষে কিছুই দেবে না। আমাদের পাওনাগণ্ডা জোর করেই আদায় করব।

আরও কতকগুলো কণ্ঠ সায় দিয়ে ওঠে। সকলের সমবেত রায় প্রদ্যুম্ন অমান্য করতে পারে না। তেমনি বিনা আড়ম্বরে প্রত্যাখ্যাতও হয় সে।

সুব্রত তড়িৎ বেগে প্রদ্যুম্নর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

—দেবে না ? তোমার মর্জি ? কোথায় যায় চার আউন্স পিঁয়াজ ?

—যেখানেই যাক, আপনার কি ?

—আমার রেশন, যেখানে সেখানে যাওয়া চলবে না।

—নালিশ করুন গে।

—আমি জোর করেই নেব। তুই গিয়ে নালিশ কর।

এগিয়ে গিয়ে এক থাবলা তুলে নেয় সুব্রত।

আধবয়সী স্থূলকায় বাবুর্চিটি তার হাত চেপে ধরে। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে স্থূলকায় লোকটি ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে।

সোরগোল পড়ে যায়। রুখে ওঠে রসুইখানার লোকগুলো। তেমনি রুখে দাঁড়ায় হেড-কোয়ার্টার্স ট্রেনিং উইং-এর একঝাঁক বাঙালী ছেলে। বয়স্ক লোক নেই। বেশীর ভাগ স্কুল-কলেজ ছেড়ে সবে এসেছে। হুজুগে পিছিয়ে যায় না।

অবস্থা অনুকূল নয় জেনেই হেড-বাবুর্চি ছুটে যায় নালিশ জানাতে।

হাবিলদার আবদুল হামিদ বিচারকের গাম্ভীর্যে ঘরে প্রবেশ করেন। উত্তেজনা যেন মন্ত্রবলে থেমে যায়। ভিজে বিড়ালটির মতো চুপ করে যায় সব।

সুব্রতর সম্মুখে এগিয়ে যান আবদুল হামিদ।

—চল, কোয়ার্টার গার্ড।

বেপরোয়া সুব্রত। কোনো প্রতিবাদ করে না।

—বেশ, চলুন।

প্রতিবাদ করে পৃথ্বীশ।

—আমাদের রেশানের পিঁয়াজ কোথায় যায় বলে যাবেন হাবিলদার সাব।

—ও, তোমরা কুমিটি করেছো! তুমিও তাহলে একজন রিং-লীডার। তুমিও চল।

পৃথ্বীশ চারদিক তাকায়। কেউ প্রতিবাদ করে না। আবদুল হামিদের অগ্রে সুব্রত ও পৃথ্বীশ মার্চ করে চলে যায়।

মাথা গুঁজে আহার করে বাকী সকলে।

অভুক্ত মানুষের কাছে খাদ্যের ভালোমন্দ নেই। সমস্ত আহার-কক্ষ জুড়ে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা।

প্রদ্যুম্নর খাবার প্রবৃত্তি আর নেই। রুটির অপচয় অমার্জনীয়। ডাস্টবিনের কাছে ডিউটি দেয় রেজিমেণ্ট্যাল পুলিশ। ফেলতে যাওয়া বিপজ্জনক। লুকিয়ে প্যাণ্টের পকেটে রুটিগুলো ঢুকিয়ে দেয়। ডালটা ডাস্টবিনে ফেলে রেশন-টিন ধুয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে।

দশটা থেকে একঘণ্টা ক্লাস। এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছুটি। আধঘণ্টা ক্লাস। সায়াহ্ন চা। পাঁচটায় আধঘণ্টা প্যারেড, একঘণ্টা খেলাধুলো। নৈশ ভোজন। আবার আটটা থেকে রাত নটা অবধি ক্লাস।

দুপুরের দীর্ঘ বিরামে লক্ষ্মৌর ১১০° ডিগ্রি উত্তাপ মানুষগুলোকে পটল-ভাজ করে। মোটা তোয়ালে জলে ভিজিয়ে গায়ে চাপা দিলে বড় জোর আধঘণ্টা। আবার সেটাকে জলে ভিজিয়ে নিতে হয়।

ব্যারাকেও কঠোর নিয়ম। এক চারপাইয়ে দুজন বসতেও নেই। আড্ডা দিতে হলে মৃত্তিকা আশ্রয়।

হাবিলদার দেওকীনন্দনের সঙ্গে অনাথের একটু জমাট ভাব। বিড়ি সিগারেটের আদানপ্রদান, এমনকি রসাল ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলে। অর্থাৎ

অনাথের ঘাড় ভাঙছে দেওকীনন্দন। একটুখানি নেকনজরের জন্য অনাথও এই আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিয়েছে।

দুপুরের অব্যবহিত পর অনাথের কাছেই সমবেদনা জানায় দেওকীনন্দন।

—তোমরা হলে রঙরুট। ফৌজী আইনকানুন কিছু জান না। এটা তোমাদের ঘর নয় বাবা!

অনাথ একবাক্যে স্বীকার করে।

—লঙ্গরখানায় যে কাণ্ডটা ঘটল, তার জন্য কোর্ট-মার্শাল হতে পারে। আর তার মানে জীবনটাই বরবাদ।

সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির ভয়ে অনাথ যেন অভিভূত হয়ে পড়ে।

তারপর প্রস্তাবটা দেওকীনন্দনই উত্থাপন করে।

—জমাদার সাহেব দিলদরিয়া লোক। তোমরা পাঁচ-ছজন গিয়ে তাঁকে খোশামোদ করে ধরে বস। তিনি ইচ্ছে করলে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কথাটা অচিরেই দুটো ব্যারাকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত প্রচার হয়ে যায়। সেই পাঁচ-ছজনের নেতৃত্ব নিতে প্রদ্যুম্নর কাছে উপস্থিত হয় অনন্ত।

প্রদ্যুম্ন সন্দিগ্ধ।

—দেওকীনন্দন ওদের একদলের লোক। কোর্ট-মার্শাল থেকে বেকসুর খালাস! দরদের একটু আধিক্য মনে হচ্ছে না অনন্ত?

অনন্ত জবাব দেবার আগেই লাফিয়ে ওঠে কল্যাণ।

—সুব্রত কিংবা পৃথ্বীশের কোনো ক্ষতি হলে সেটাই কি ভালো হবে?

—নিশ্চয় কোথাও ওদের গলদ আছে। ক্ষতি করতে পারলে তা না করে তোমাদের উপদেশ দিতে আসতো না।

—ঝঞ্ঝাটটা দুটো কথায় মিটিয়ে ফেলা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

কল্যাণ রেগে যায়। অবনী নীরেন অনাথ কল্যাণকেই সমর্থন করে। সুপারিশ জানাবার দলটা অচিরে ভারি হয়ে ওঠে।

যাবার ইচ্ছে হয় না প্রদ্যুম্নর। ঘটনাটা ঘটেছে তাকে কেন্দ্র করেই। দুর্বলতা বোধ করে। তবু পরিহার করতে পারে না।

জমাদার দেওয়ান সিংকে তারা প্যারেড-গ্রাউণ্ডে দেখেছে। দেখেছে আঁধারের আলোর রোল-কলের একপ্রান্তে অত্যন্ত দর্পিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে। মুখোমুখি এই প্রথম।

দেওকীনন্দন বলেছিল ভালোলোক। কিন্তু কণ্ঠস্বরে অপরিসীম রুক্ষতা। প্রতিটি বাক্যে অপমান সূচের মতো ধারালো। এমন একটা উদ্ধত ভাব, যেন ইচ্ছে করলেই মুহূর্তে যে কারো দণ্ডমুণ্ডের বিধিব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

প্রত্যুম্নরা প্রার্থী। সমস্ত অপমান মাথা পেতে মেনে নিতে হয়।

বাবুর্চিদের ডাক পড়ে। সুব্রত এবং পৃথ্বীশকেও হাজির করা হয়। ঘণ্টা দেড়েক শাসানি, শ্লেষ ও কটূক্তির বিনিময়ে দুজনেই মুক্তি পায়।

মাথা নীচু করে নিজের চারপাইয়ে এসে আবার বসে সুব্রত। তার পাশেই প্রত্যুম্নর খাটিয়া। জমাদার সাহেবের কাছে লাঞ্ছনা এবং নিজেদের পরাজয়ের গ্লানিতে সুব্রতর মুখের পানেও তাকাতে পারে না সে।

রাত্রে উঠানে কিংবা বারান্দায় সকলে চারপাই বের করে নেয়। দশটায় সমস্ত আলো নিভে যায়। ক্লান্ত মানুষগুলোর আদ্ধেক তার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। বাকীরাও শয্যায় আশ্রয় নেয়। পারপার্শ্বিকতা নিষুতি হয়ে ওঠে।

মশারির নীচে থেকে সুব্রত গলা বের করে। বলে—ঘুমিয়ে পড়েছিস প্রত্যুম্ন ?

—না।

—শালা জমাদার প্রাণভরে খিস্তি-খেউড় শোনাল। কিন্তু যে শালারা রেশন বেচে তাদের একটা কথাও বলল না।

—সব শালা একদল। তুই কি ভাবিস জমাদার ভাগ পায় না ?

—আর আমরা উপোস থেকেও লাথি খেয়ে মরি—

—ডিসিপ্লিনের এই প্রথম পাঠ—

আবার নিষুতি হয়ে আসে। কিছুক্ষণ বাদে আবার কথা বলে সুব্রত—তোরা ছাড়িয়ে আনতে গেলি কেন ? শেষটাও দেখে আসতাম।

—সবাই ভয় পেল যে—

—ওরা যে দয়া দেখায় তার মধ্যে সত্যি সত্যি কোনো দয়া আছে তুই মনে ভাবিস—

—না, অন্তত আমি ভাবি নে—

—জমাদারের কথাগুলো ভেবে দেখ দিকিন।—তোমরা বাবুলোগ—আশা করি বুটের ঠোক্করে তোমাদের ইজ্জৎ বাড়াতে হবে না।

—মনুষ্যত্বের শেষ ধাপে আমরা নেমে গেছি সুব্রত—প্রত্যুম্নর কণ্ঠে হতাশা বাজে।

সুব্রত দৃপ্তকণ্ঠে বলে—ফৌজ মানেই জন্তু। সে কথা জানি। কিন্তু আমরা এক-একটা জন্তু নই। কোনোদিন হতেও পারব না।

হাবিলদার মেজর রহমতুল্লা নাইট-চেকিংএ বেরিয়েছে, অনতিদূরে তার লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। লাইনে অবনীর সেণ্ট্রি-ডিউটি। এসে চুপি চুপি বলে—চুপ করে যা। শালা চলে যাক। নইলে এখনই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিস বলে শোর তুলবে।

তখনকার মতো চুপ করে গেলেও রাত্রির বিলম্বিত প্রহর পর্যন্ত ফিসফিস করে কথা বলে সুব্রত ও প্রদ্যুম্ন।

একটা রাত চলে যায়।

কিন্তু কোনো রাতকেই বিদায় দেবার রীতি এই ৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানে নেই।

চারটা না বাজতেই গোটা ব্যাটালিয়ান জেগে উঠবে। লঙ্গরখানায় মোটা মোটা কাঠের চেলায় আগুন ধরিয়ে অতিকায় ডেকচিতে চায়ের জল চাপানো হবে। প্রাতঃকৃত্যের জন্য লাইন পড়বে পায়খানায় এবং কলতলায়। খাটা পায়খানা। দুর্গন্ধময় পরিবেশ। কঠোর সহিষ্ণুতায় কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে সময়ের লেখাজোখা নেই। মশারি-বিছানা পাট করে কিটব্যাগে পুরে রাখতে হবে। তারপর চারপাইয়ের চৌহদ্দি নিকানো, পোশাক-আঁটা, চা পান, ফল্‌-ইন্‌।

ফল্‌-ইন্‌ ফর প্যারেড, অথবা সিক্‌ প্যারেড। পরেরটা অবশ্য অসুস্থ হলে। পরীক্ষা করে ডাক্তার অসুস্থ নয় বললে শাস্তি।

সকালবেলা প্রদ্যুম্ন ও কল্যাণ সিক্-রিপোর্ট-এ নাম লেখায়। কল্যাণের ভাগ্যে জোটে অ্যাটেণ্ড 'বি'। অর্থাৎ লাইট ডিউটি। প্যারেড-গ্রাউণ্ডের গাছের নীচে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ প্যারেড শেষ না হয়। অনেক অভিনয় করে প্রদ্যুম্নর অ্যাটেণ্ড 'সি'—পুরো বিশ্রাম। আইন-মাফিক সমস্ত দিন তাকে শুয়ে থাকতে হবে ব্যারাকে। অন্যথায় লাইন সেণ্ট্রির কর্তব্য ব্যারাক ইনচার্জ হাবিলদারকে জানানো।

তিন ঘণ্টা করে পালাক্রমে সেণ্ট্রি ডিউটি শিক্ষার্থীদের। সকালবেলা ডিউটি পড়েছে অনন্তর। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে লঙ্গরখানার অদূরে গাছের নীচে পাহারায় বসে প্রদ্যুম্ন।

সাত হাজার লোকের ৮ নম্বর ব্যাটালিয়ান খাঁ খাঁ করছে।

অনতিদূরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে আঁকাবাঁকা রেখার মতো মানুষের সারি। একঝাঁক বুট একসঙ্গে পড়ার ঐকতান। ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে লেফট্ রাইট্ মার্চিং নির্দেশ।

ক্লোদিং স্টোরের সামনে নতুন রঙরুটদের লাইন। ল্যান্স-নায়ক গৃতম সিং রাজকীয় মেজাজে তাদের হাঁকাচ্ছে। মেজর হেল্ডেনের কুকুরটার উকুন বাছছে দুজন সেপাই।

লঙ্গরখানার পারিপার্শ্বিকতা শব্দহীন। দিনের উত্তাপ বাড়ছে। শুষ্ক মৃত্তিকাস্তরে সেই উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে পৃথিবীকে ঝেঁঝে দেবার জন্য। একটু পরেই হয়ত লু বইবে। ঝঞ্ঝাবায়ুর আমন্ত্রণে তপ্ত ধূলিকণাগুলো চোখ অন্ধ করে দেবে। বন্ধ হয়ে আসবে নিশ্বাস। আর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মাথার চুলে কর্কশ ধূলিকণার আস্তরণ পড়বে।

শিশুগাছটির পাতাগুলো ঘন নয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাশি রাশি সূর্যের কণা তাকে যেন ছেঁকে ধরে। এখানে বসা আর সম্ভব নয়। লাইনে ফিরে অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে সে। অনন্তর সঙ্গে কথা বলেও সময় কেটে যাবে। রৌদ্রের উত্তাপ আর একঘেয়ে মৌনতা তাকে চঞ্চল করে তুলল।

তবু যাবার আগে রসুইঘরের পাশে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

স্তূপীকৃত আটার কাই।

এক এক খণ্ড গুলানো আটা হাতের চেটোয় পিটিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে রুটি তৈরী করছে জনা-তিনেক লোক। লম্বা তাওয়ায় সেঁকছে আরো দুজন। লঙ্গরখানার উঠানের শেষপ্রান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে কর্তব্যরত রেজিমেন্ট্যাল পুলিশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হেডকুক বেড়ার অপর ধারে একটি প্রায়বৃদ্ধা ভিখারিনীর সঙ্গে কি বলছে। কৌতূহল হয় প্রত্যুম্নর। তাদের অশ্লীল হাসি, বাঁকাচোরা চাহনি, আর অশোভন অঙ্গভঙ্গী ছাড়া এখান থেকে কিছুই শোনা যায় না। ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যুম্ন। উত্তাপে খাকী উর্দি পর্যন্ত তেতে ওঠে।

অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে কথা বলে হেডকুক লঙ্গরখানায় ভিতরে যায়। ছেঁড়া ফৌজী সংবাদপত্রে একতাল রুটি জড়িয়ে নিয়ে আসে। বেড়ার ফাঁক গলিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভিখারিনীটা ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নেয়। চোখে মুখে উজ্জ্বল খুশী। বিড়বিড় করে কি বলে। হয়ত ওরা শুনতে পায়। সমস্ত

দেহটা কুৎসিত ভঙ্গিতে লীলায়িত করে ভিখারিনীটি চলে যায়। কিন্তু তার কদর্যতা প্রদ্যুম্নকে যেন বেত্রাহত করে।

প্যারেড থেকে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে ক্ষেপে যায় সুব্রত।

—তুই একটা আস্ত উল্লুক। এমন কাণ্ডটা দেখেও মনের সুখে চলে এলি?

—কি করব?

—ডেকে এনে দেখাতে পারলি নে সেই জমাদারের বাচ্চাকে?

—বেড়ার ওপারে যাবার উপায় নেই। রুটি নিয়ে মেয়েটা তো চলেই গেল। ডেকে এনে প্রমাণটা কি দেখাতাম।

—মুখের জোর তো ঢের আছে। না-হয় চেঁচিয়ে দু-চারজন লোককে সাক্ষী রাখতিস।

—তা হয়ত পারতাম। কিন্তু 'অ্যাটেণ্ড সি' পেয়ে ঘুরে বেড়ানো আইন নয়।

—রেখে দে তোর আইন। আগাগোড়া একটা জুলুমের রাজত্ব। জুলুমের ভয়ে জুলুম সহ্য করা খুব বাহাদুরি নাকি?

পৃথ্বীশ মাঝখানে মাথা গলায়।

—শালাদের ঢিট করতে হবে। পাকাপাকি একটা ফন্দী আগে থাকতে ঠিক করে নে সুব্রত। নইলে আবার গ্যাজে গোবরে করবে।

—এমনি বড় বাকীটা রেখেছে।—ভেংচি কাটে সুব্রত।

পৃথ্বীশের চোখে মুখে উদ্বেগের সঙ্গে তির্যক সংকেত ফুটে ওঠে—চুপ। অনাথ শালা হাবিলদার-মেজরের স্পাই।

—কে বলেছে?

—আমি নিজের কানে শুনেছি।

মুখে ঘৃণা সুপরিস্ফুট করে উঠে যায় সুব্রত।

দিন দুই বাদে অসুখের ভান করে সুব্রত। 'অ্যাটেণ্ড সি'-ও পায়।

অঘটন আশঙ্কা করে সতর্ক করতে যায় প্রদ্যুম্ন। কিন্তু মুখ-নাড়া দেয় পৃথ্বীশ।

—দেখছিস না? পি টি প্যারেডের নাম করে শরীরের রক্ত শুষে নিচ্ছে।

কথাটা অত্যন্ত সত্য। প্রদ্যুম্নরও তাই বিশ্বাস। ইদানিং পি টি চার্ট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ প্রক্রিয়াগুলো দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলন করানো হচ্ছে। ট্রেনিং ম্যানুয়েলে নির্দেশিত শারীরিক ব্যায়ামের

ক্রমবাহিকতা ইন্সট্রাক্টররা মানছে না। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে অসহনীয় ক্লেশ। প্যারেড গ্রাউণ্ডে সেই কথাই জমাদার সাহেবের কাছে আবেদন জানিয়েছিল অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও পেয়েছিল। দীর্ঘ প্যারেড গ্রাউণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চার পালা ডাবল আপ্। সে হুকুম মানতেও হয়েছিল তাকে।

অনিমেষের সে সময়ের মুখখানা প্রদ্যুম্ন ভুলতে পারে নি। একটা ক্লান্ত কুকুরও এতটা হাঁপায় না। তাদের গ্রামে মধু দারোগা সন্দেহের বশে দাগী চোর আনোয়ার আলীকে প্রহার করেছিলেন। মারের চোটে বারো ঘণ্টা অনবরত জল খেয়েও প্রাণটাকে ধড়ে আটকে রাখতে পারে নি আনোয়ার আলী। নির্যাতিত আনোয়ার আলীর মুখে যে যন্ত্রণা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তারই সুস্পষ্ট আভাষ দেখেছিল সে অনিমেষের মুখে। শিউরে উঠেছিল। আনোয়ার আলীর ভাগ্যে ওষুধ জোটে নি। অনিমেষের ওষুধ জুটেছে। ডাক্তার লিখেছেন হিট-একৃজশান। হাসপাতালেও পাঠিয়েছেন।

প্রদ্যুম্ন জেনে রেখেছে, এখানকার জমাদার সুবেদার এবং তাদেরও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মধু দারোগার দানবীয় ব্যক্তিত্বের অতি সক্রিয় প্রতিভূ। মনের মধ্যে তাই বিরুদ্ধ ভাবনা প্রাধান্য লাভ করে। বলে—সাপকে তখনই ঘাঁটানো যায় সুব্রত, যখন তাকে মারবার নিশ্চিত অস্ত্রটি হাতে থাকবে। এই ছিটেফোঁটা অভিযোগ-নালিশে ওদের চামড়ায় কোনো আঁচড় পড়বে না।

—বাড়ির বৈঠকখানায় বসে মেয়েদের কাছে এসব দর্শন ফলাস। শুনতে বেশ লাগবে।—শ্লেষ করে সুব্রত।—জুলুম ঠেকাতে বেপরোয়া না হলে উপায় নেই।

বাইরে ফল্-ইন্-এর সিটি বাজে। মনের উদ্বেগ মনে রেখেই বেল্টটা কোমরে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় প্রদ্যুম্ন।

সুযোগ কি রোজ আসে! প্রদ্যুম্নর মূর্খতার আফসোস সুব্রতর মনে ঠেলে উঠতে থাকে।

জুন মাসের মেঘ-লেশ-হীন আকাশ। চোখ ঝলসানো রোদ। মাটির ভেতর থেকে তাত উঠছে। নটার বিউগ্যাল বেজে গেল। ক্লোদিং স্টোর ঘুরে আবার লঙ্গরখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় সুব্রত। এই পথে বার চার-পাঁচ

আসা-যাওয়া করেছে। রাঁধুনীদের দু-একটা কথা, হাসি পরিহাস, হাতের চেটোয় রুটি তৈরীর শব্দ, বাসন-পত্রের দু-একটা ঠুনঠান। তা ছাড়া উদ্দেশ্যের অনুকূলে কিছুই সে শুনতে পায় নি। দেখতেও পায় নি।

আবার সে ঘুরে আসে। টেপ থেকে ঢক্‌ঢক্ করে এক পেট জল খায়। তারপর অবচেতন মনের সংকেতেই যেন খাবার হলের দোরে গিয়ে দাঁড়ায়।

হলের মাঝখানে হাতের চেটোয় রুটি ঠুকছে দুজন। তাল করা আটার কাইগুলোতে স্বেদ-নির্ঝর ঝরে পড়ছে।

ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। সমস্ত রুচিবোধ থেকে কদর্যতার মাঝখানে যেন তারা তলিয়ে গেছে। সমস্ত নোংরামির সঙ্গে নোংরা খাদ্যও যেন এখানকার যান্ত্রিক বিধানের অঙ্গ।

অদ্ভুত শ্লেষের হাসিতে নিজের মনটাও হেসে ওঠে। এগিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের পিছনে দৃষ্টি পড়ে।

হপ্তায় দুদিন মিট্-ডে। মাংস রান্না হয় রাত্রে। দুটুকরো আলুর সঙ্গে ছোট্ট দুটুকরো মাংসের বেশী কারো ভাগ্যে জোটে না।

দুজন রাঁধুনী খেতে বসেছে। ডেকৃচির ডালায় একতাল করে ঘি-জব্‌জবে রুটি। রেশন টিনের এক ডালায় কুমড়োর ছক্কা। অপর ডালায় আগের দিনের কষানো মাংস।

উত্তেজনায় সুব্রতর গায়ে যেন জ্বর আসে।

বাবুর্চিদের রেশন ফলোয়ার লঙ্গরখানায়। হেড-কোয়ার্টার প্লাটুনের ক্লার্ক হাবিলদার ট্রেনিদের লঙ্গরখানায় এদের খাবার হুকুম নেই। সুব্রতর এ তত্ত্ব জানা আছে। এরা খাচ্ছে তাদের রেশন। বেশ পরিপাটী রান্না করে। কালকের মাংস থেকেও চুরি করে রেখেছে আজকের জন্য। আর তাদের ভাগ্যে জুটবে আধ-সেদ্ধ ভাত কিংবা শুকনো রুটি। খোসাসমেত কলাইয়ের ডাল—হয় নুন বেশী, নয়ত ঝালে পুড়িয়ে রেখেছে।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে সুব্রত। সাফল্যের আনন্দে শরীরে অপরিমেয় শক্তি আসে। চক্ষের নিমেষে উনুনের পাশ থেকে মাংস ও কুমড়ো সমেত খাবার পরাত তুলে নেয়। বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বেশীদূর আসা সম্ভব হয় না। লঙ্গরখানার লোকেরা ঘিরে ফেলে। রেজিমেন্টাল পুলিশ আবির্ভূত হয়।

মেন অফিসে স্থবেদার মেজরের কাছে অভিযুক্ত হয় স্থব্রত এবং হেডকুক
স্থব্রত লাইনে ফেরে একটায়। কি হল, স্পষ্ট সে বুঝতে পারে নি। জমাদার দেওয়ান সিং, কোয়ার্টার-মাস্টার ক্যাপ্টেন ব্রিগ মেন অফিসে অনবরত যাওয়া আসা করছেন। স্থব্রতর প্রতি নির্দেশ হয়েছে লাইনে ফিরে আসবার।

স্থব্রত গর্বিত। দুষ্কৃতিকারী ধরা পড়েছে। এই তার জয়।

হেড-কোয়ার্টার্স ট্রেনিং প্লাটুনের দু-দুটো ব্যারাকে বিজয় উল্লাসের হল্লোড় পড়ে। কল্যাণ, পৃথ্বীশ, অনিমেষ প্রায় জন পনেরো স্থব্রতকে ঘিরে রাখে। লক্ষ্ণৌর ১০৮ ডিগ্রি উত্তাপে ভিজে তোয়ালে চাপা দেবার প্রয়োজন ভুলে যায়।

তিনটায় হাবিলদার দেওকীনন্দন স্থব্রতকে ডেকে নিয়ে যান।

তাকে কোয়ার্টার গার্ডে রাখা হয়েছে।

সংবাদটা যেন হাওয়ায় ভেসে আসে।

চাপা উৎকণ্ঠা আর জল্পনা। কি হবে, কি তার অপরাধ—মুখে মুখে এক প্রশ্ন।

দুটো ব্যারাকে কারো এর জবাব জানা নেই।

রাত্রি নটায় রোল-কল।

কোয়ার্টার-গার্ডের পিছনের মাঠে অন্ধকার আকাশের নীচে সারিবদ্ধ সাড়ে ছ হাজার লোক ঘন হয়ে দাঁড়ায়।

—রোল-কল অ্যাটেনশন—

—হেড-কোয়ার্টার প্লাটুন ঠিক। এক নম্বর ঠিক। দু নম্বর এক এবস্কণ্ড ঠিক। তিন নম্বর এক এবস্কণ্ড, তিন হাসপাতাল—ঠিক। চার নম্বর····পাঁচ নম্বর····

—রোল-কল স্ট্যাণ্ড অ্যাট-ইজ—

অন্ধকারে স্থবেদার শোহন সিং-এর মুখ দেখা যায় না।

ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন শোহন সিং।

উপসংহারে উদাত্ত হয়ে ওঠে শোহন সিং-এর কণ্ঠ :

—আজকের বড় খবর—হেড-কোয়ার্টার প্লাটুনের কোনো রঙরুট ডিসিপ্লিনের খেলাপ অন্ত রঙরুটদের সঙ্গে দল পাকাবার চেষ্টা করেছে। লঙ্গরখানায় ঝামেলা সৃষ্টি করে বাকী রঙরুটদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে সে। এই অপরাধে

কোর্ট-মার্শাল হওয়াই নিয়ম। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কর্নেল সাহেব দয়া করে তাকে কেবলমাত্র বরখাস্ত করেছেন। ফৌজ, তথা পুলিশের খাতায় রাজদ্রোহী হিসাবে সে গণ্য হবে। বাকী জীবন পুলিশের জুলুম তাকে বরদাস্ত করতে হবে।

রঙরুটদের সতর্ক করা হচ্ছে, নিজের দেমাক খাটিয়ে কোনো কাজ করবার চেষ্টা যেন তারা না করে। ফৌজী কানুন হামেশা মেনে চলে। দ্বিতীয়বার কেউ এই অপরাধ করলে কোর্ট-মার্শাল নিশ্চিত।

মানুষকে ভগবান যখন মারেন সেটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু যে ব্যবস্থা মানুষকে শুধু আঘাত দেয়, তার কোনো সার্থক উদ্দেশ্য থাকবে এমনও নয়। তার প্রতিকার যেখানে নেই, মানুষ সেখানে আত্মসমর্পণ করবে এমনও নিয়ম নয়।

হেড-কোয়ার্টার প্লাটুনের এগারো নম্বর টোলির উপর নির্যাতনের ঝড় বইছে। প্রতিবাদের কণ্ঠ ভয়ে নিস্তব্ধ। চাপা ক্ষোভ গুমরে কাঁদছে। এড়িয়ে যেতে চাইছে সবাই। খুঁজছে আড়াল। আর যারা দুর্বল—খুঁজছে করুণা।

কৃপার্থীর দলটি স্ফীত হচ্ছে প্রতিদিন।

হাবিলদার দেওকীনন্দন ব্যারাকের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত যখন পরিক্রমা করে যায়, এখন তার উদ্দেশে কপালে হাত ওঠে। অথচ দুদিন আগে ঘৃণায় তার সঙ্গে বোধহয় কেউ কথাও বলতো না।

অনন্ত পরিষ্কার বলে—নাচতে যখন নেমেছি, ঘুঙুরও বাঁধতে হবে, ঘোমটাও খুলতে হবে।

পৃথ্বীশ আমতা আমতা করে বলে—সয়ে যা। আর দু হপ্তা। তারপর আমরাও হাবিলদার। ব্যাজ এঁটে অফিসে গিয়ে বসব। জেনারেল ডিউটি হাবিলদাররা আসতে যেতে সেলাম করবে।

সেই প্রত্যাশিত দিনটির স্বপ্নে আজকের দিনের গ্লানি থেকে অব্যাহতি নেই। রাত দশটা অবধি কারণে-অকারণে বাঁশী বাজে। একাধিকবার। ব্যারাকের সামনে একফালি উঠানটুকুতে স্পার্টান ভঙ্গিতে দাঁড়ায় দেওকীনন্দন।

মানুষগুলো ছিটকে এসে বাইরে দাঁড়ায়। একমুহূর্ত দেরী হবার উপায় নেই। যে অবস্থায় যে আছে। নগ্নদেহ, রিক্তপদ কিংবা আণ্ডার-ওয়ার মাত্র পরিধানে।

দেওকীনন্দনের শ্লেষ শোনা যায়।

—বাবুদের গতর বুঝি নড়তে চায় না। জলদী, জলদী, বহুত জলদী। গাধার মতো ঝিমিয়ে চলতে লজ্জা করে না?

অনেকের মতে এই রূঢ়তার জন্য দায়ী নয় এখানকার স্বৈরতন্ত্র। দায়ী সুব্রত। গর্তের ভেতর থেকে সাপকে খুঁচিয়ে বের করলে সে ছোবল তুলবেই।

এখানকার কর্তৃপক্ষ অমেয় শক্তিশালী। কতকগুলো বেয়াড়া রঙরুটের আস্পর্ধা সহ্য করবেন কেন? উৎপীড়ন যে ফৌজী-শৃঙ্খলাবিধানের অঙ্গ এখানকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও তাতে অবিশ্বাস নেই।

এগারো নম্বর টোলির হাবিলদার ট্রেনিরা এই রোষবহ্নি হজম করছে। নীরবে নয়। ধিক্কার দিচ্ছে সুব্রতকে। তার ছিটে-ফোঁটা পড়ছে প্রদ্যুম্নর ভাগ্যেও। এক টুকরো পেঁয়াজের জন্য ন্যাকামি না করলে ট্রেনিং-এর বাকী দিনগুলো যেমন করে হোক কেটে যেতো।

আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না প্রদ্যুম্নর।

সবচেয়ে চালু অনন্ত। একটা সুড়ঙ্গ খুঁজে পেয়েছে। সন্ধ্যার পর হাবিলদার মেজর আবদুল হামিদের সঙ্গে চলে যায় ধুবীখানায়। রেগুলার ধুবীর ফিল্ডে ঢের চাহিদা। একপাল সিভিলিয়ান ধুবী বসানো হয়েছে ব্যাটালিয়নের প্রত্যন্তদেশে। পরিবার পুত্র নিয়ে তাদের বেসামরিক জীবনযাত্রা। সাধারণ রঙরুটদের ওখানকার সীমানা মাড়ানোর হুকুম নেই। হাবিলদার মেজর আবদুল হামিদ রঙরুট নয়। তার অবাধ গতি। প্রতাপ অখণ্ড।

নৈশ-ক্লাসের পর রোল-কলের ফল্-ইন্। হাবিলদার দেওকীনন্দন রঙরুটদের হাজিরা মিলিয়ে গেল। অনন্তর অনুপস্থিতির জন্য অপূর্ণ সংখ্যাটা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে দেখা যায় না।

অনন্তর রহস্য প্রদ্যুম্ন জানে।

সন্ধ্যা হতেই চারপাইগুলো বাইরের উঠানে বের করে সারি লাগাতে হয়। ব্যারাকে যে অর্ডারে আছে সেই অর্ডারে। মশারি খাটিয়ে দিতে হয়।

রাত বারোটার পর একদিন ফেরে অনন্ত। খাটানো মশারির বাইরে চারপাইয়ের কাঠের উপর বসে। গুন্‌গুন্ করে সুর ধরে—

মোহব্বৎ মে মেরা দিল
দিওয়ানা
পিতম তুঝে চাঁদ
বনকে আনা।

গুমোট গরমে প্রদ্যুম্নর চোখে ঘুম নেই। ধমক দেয়।

—নে শালা, চুপ কর্। রাত ক'টা বাজালো খেয়াল আছে?

—বকিস নে। ভিরমি খেয়ে যেতিস শালা। মানুষ নয়। বেহেস্তের হুরী।

—তোর মুণ্ডু—

—শালা পাগোল।—একখানা গলা মাইরি। যেন শান-দেওয়া ছুরি।

—কার?

—সিতারি বাঈ—

—সে আবার কে?

—লক্ষ্ণৌ চকের। দেখলে তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস।

—আবার তুই মদ গিলেছিস?

—দেখ উপদেশ দিবি নে প্রদ্যুম্ন। জীবনটার দাম একটা জাপানী গুলি। ছ আনা কি ছ পয়সা। এখানে সৎ ছেলে সেজে থাকার কোনো অর্থ নেই। নে, সিগারেট খা—

মশারি গলিয়ে মাথাটা বের করে প্রদ্যুম্ন।

—স্টেট এক্সপ্রেস!—জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট পড়তে পারে।

—আই. জি. এস. সি-র এক জমাদার ডাঁট দেখাতে নিয়ে এসেছিল। এক নৌকায় ঝেড়ে দিলাম—

বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধে প্রদ্যুম্নর পেটের নাড়িগুলো ঠেলে ওঠে।

—পরকালটা ঝরঝরে করিস নে, অনন্ত—

—খেত্তর। আবার সেই নীতিকথা। ঘরের বৌকে গিয়ে বলিস।

প্রদ্যুম্ন জবাব দেয় না। মশারির ভেতর সিগারেট খাবার আইন নেই। মাথাটা তাই টেনে নিতে পারে না।

অনন্ত বাহাদুরীর কণ্ঠে বলে, আজ একশ'র উপর জিতেছি। শালারা একদম আনাড়ি। ভাঁজ দিলেও ধরতে পারে না।

একটা পরিহাস করবার লোভ প্রদ্যুম্ন সংবরণ করতে পারে না।

—ক্ল্যাশে হার খেয়েও শালারা তোকে কোয়ার্টার-গার্ডে বন্ধ করে দেয় না?

অনন্ত খিক-খিক করে হাসে।

—শালারা পুরো চালু। রোজ মক্কেল ধরে আনছে, আর আমি টানছি। আজকেও নিয়ে এসেছিল এক সুবেদার আর এক জমাদারকে। শ'দুই টাকার পিণ্ডি করে গেল দুজনে।

—সবটা তুই জিতলি?

—জিতলে কি হবে। চার ভাগ। দু ভাগ জমাদার দেওয়ান সিং। একভাগ আবদুল হামিদ। একভাগ আমি। সেই একভাগ থেকেও আবার রামলগন ধুবীর বকশিস। ধেনোর দাম। বিড়ি-সিগারেটের আক্কেল-সেলামি। তা যায় যাক। উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যাক।

প্রদ্যুম্নর ঘৃণা হয়। তেমনি দুঃখও হয় অনন্তর এই অধঃপতনে। বলে, সমাজ সংসার—কোনোদিন সেখানে কি ফিরতে হবে না? কোথায় নেমেছিস ভাব দিকিন, অনন্ত।

—ননসেন্স। যখন রোমে তখন রোমানদের মতো চলবে—ভারিক্কি গলায় বলে অনন্ত—এখানে কোন্ শালা সৎ? এই যে সুব্রতকে তাড়িয়ে দিলে, এন্‌কোয়ারী হলে হেল্‌ডেনের টিকিও বাদ যেত না।

অসীম কৌতূহলে প্রদ্যুম্ন একাগ্র হয়। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয় না।

—হেল্‌ডেনের মেমসাহেবের চারটে কুকুর। রোজ চার-পাঁচ সের মাংস ব্যাটালিয়ন থেকে চালান দিতে হয়। সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার এরা সব ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। রেশন পায় একজনের। বাকীদের জন্য কি চাল ডাল কিনে আনে? ঐ লঙ্গরখানা থেকেই যাচ্ছে।

—বাজে বকিস নে—

—শালা জমাদার নিজে আমাকে বলেছে।

—ও মিথ্যে কথা।

—তুই একটা ইডিয়ট। মাতাল বৌয়ের কাছে মিছেকথা বলে। মাতালের কাছে মাতাল কখনও মিথ্যে বলে না।

আশ্চর্য নয়—হতবাক্ প্রত্যুম্ন।

সিগারেটের শেষপ্রান্তটুকুর আগুন আঙুলে লাগছে। মাটিতে ঘষে নিবিয়ে মশারির ভেতর মাথা টেনে নেয়।

অনন্ত আরেকটা সিগারেট ধরায়। সাড়া না পেয়ে ডাকে—ঘুমিয়ে পড়েছিস প্রত্যুম্ন—

—চেঁচাস নে। টের পেলে দেওকীনন্দন এসে তিনপুরুষ উদ্ধার করবে।

ধপাস করে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে অনন্ত। আপনমনেই বিড়বিড় করে। শালা দেওকীনন্দন। শুয়ারকা বাচ্চা। আমার জুতো বয়ে বেড়াবে শালা। জমাদার দেওয়ান সিং আমার হাতে। মজা পেয়েছিস বাবা। এ ভানুমতীর খেল।

প্রত্যুম্ন চুপ করে থাকে!

দু মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

প্রত্যুম্নর চোখে ঘুম আসে না। সে ভাবে পরেশের কথা।

এখনও হয়ত লক্ষ্ণৌ প্ল্যাটফরমের আনচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরেশ। সেখানে আর. টি. ও এবং লালমুখো মিলিটারি পুলিশের কড়া ব্যবস্থা। যদি ধরা পড়ে, চরম লাঞ্ছনার জন্য এনে রাতটা হয়ত আটকে রাখবে কোয়ার্টার-গার্ডে।

মনের পাতাগুলো পরেশ খুলে ধরেছিল তার কাছে।

আঠারো পূর্ণ হয় নি। স্কুলের খাতায় আরও কম। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। ফল বেরুবার আগেই বয়স ভাঁড়িয়ে এসেছে ফৌজে।

এসেছে নয়। টেনে এনেছে। কৈশোর-প্রেমের হঠাৎ-ঘা-খাওয়া বৈরাগ্য।

কাবেরীকে সে ভালোবাসতো। বিয়ে করে কাবেরী স্বামীর ঘরে চলে গেছে।

তার কাছে গৃহ আর অরণ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

কিন্তু কেন এই পথে এসেছে তার জবাব সে নিজেও জানে না।

কেন ফিরে গেল সে-কথা বলেছে।

বলেছে—ভালো লাগে না। অসহ্য।

কিন্তু এখানকার আমলাতন্ত্র মানুষের মন বলে কোনো পদার্থকে বিশ্বাস করে না। পরেশের নিরুদ্দেশের মূলে কোনো নিশ্চিত ষড়যন্ত্র তারা অনুমান করে নেবে। এগারো নম্বর টোলির যেহেতু তৃতীয় নিরুদ্দেশ।

সকাল দশটায় রোমান-হিন্দি ক্লাসের পর পুরো টোলিকে জমাদার দেওয়ান সিং-এর অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় দেওকীনন্দন। ক্ষুধায় শরীর আড়ষ্ট। তবু প্রতিবাদ করবার সাহস কারো হয় না।

—হল্ট্—অ্যাটেনশান্।

দেওকীনন্দন জমাদার সাহেবের খাস কামরায় প্রবেশ করে। মাথার উপর একঝাঁক চোখ-ধাঁধানো রৌদ্র। মানুষগুলো দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মতো। চুলের গোড়া থেকে বুটপরা পায়ের চেটো পর্যন্ত ঘামে চুপসে ওঠে। ভ্রূ বেয়ে লবণাক্ত স্বেদবিন্দু চোখে প্রবেশ করে। চোখে জ্বালা ধরে। অ্যাটেনশান—! হাত কেটে নিলেও একচুল নড়বার আইন নেই।

জমাদার সাহেবের চট করে সময় হয় না। আধ ঘণ্টা যেন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কাটে।

সার্কাসের লায়ন-টেমার খাঁচামুক্ত বরাহের সুমুখে বেতখানা নিয়ে যে হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, হাতের ছড়িখানা নিয়ে তেমনি দাঁড়ান দেওয়ান সিং।

—পরেশকে পালিয়ে যেতে কে কে সাহায্য করেছে এ আমি জানতে চাই। তোমরা লেখাপড়া জান। নিজেদের অমঙ্গল নিশ্চয় ডেকে আনবে না। যারা জান, দোষ স্বীকার কর।

এগারো নম্বর টোলি নিরুত্তর।

—দু একজনের জন্য প্রত্যেককে শাস্তি পেতে হবে। আমি হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি।

নিস্তব্ধ রৌদ্র খাঁ খাঁ করে।

—তোমরা পার্টি করেছ। দল পাকিয়েছ। সব বদমাস। জান তোমাদের কোর্ট-মার্শাল হবে?

কণ্ঠের প্রচণ্ড রূঢ়তা যেন অগ্নিবর্ষী রৌদ্রের ক্লেশকেও গ্লানি দেয়। তবু কারো মুখে কথা সরে না।

—দেওকীনন্দন!

দুটো বুটের সংঘর্ষে খ্যাঁচ করে শব্দ হয়। অ্যাটেনশান্ হয়ে দাঁড়ায় দেওকীনন্দন।

—এদের প্যারেড-গ্রাউণ্ডে একচক্কর ডাবল্-আপ করিয়ে নিয়ে এসো।

বিস্তীর্ণ প্যারেড-গ্রাউণ্ড। এক চক্করে সোওয়া মাইল কি দেড় মাইল।

কেশব লাইন থেকে দু কদম এগিয়ে এসে অ্যাটেনশান্ হয়ে দাঁড়ায়।

—একটু জল খেতে চাই, স্যার।

—নিজের জায়গায় ফিরে যাও। বহুৎ জল শরীর থেকে বেরুবে। তাই খেয়ো।—গর্জে উঠেন জমাদার সাহাব।

প্রদ্যুম্ন বিমূঢ়ের মতো জমাদার সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। কণ্ঠে প্রতিবাদ উদ্যত হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে সে সংযত করে। এখানে হুকুমের মূল্য। প্রাণের মূল্য কিছু নেই। মনুষ্যত্বের অনুশাসন ফৌজের বিচারে বিধি-সঙ্গত নয়।

প্যারেড-গ্রাউণ্ডের আধ চক্কর এসেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কেশব। থমকে দাঁড়ায় এগারো নম্বর টোলির ছচল্লিশ জন জোয়ান।

—বিনা হুকুমে দাঁড়িয়ে গেলে। কেমন গাধার মতো আক্কেল তোমাদের—চিৎকার করে ওঠে দেওকীনন্দন।

—চোপ্ রাও—গর্জে ওঠে প্রদ্যুম্ন। লাইন থেকে বেরিয়ে যায়। মাটিতে বসে কেশবের মাথাটা কোলে তুলে নেয়। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে নাক দিয়ে।

লাইন ভেঙে সমস্ত লোক ভিড় করে দাঁড়ায়।

দেওকীনন্দন সেখানে নেই। দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত জমাদার সাহেবের খাস কামরায়।

নষ্ট হতে দেবার মতো মুহূর্তও নেই। চারজন পাঁজা-কোলে কেশবকে তুলে দ্রুত মেন অফিসের দিকে এগিয়ে আসে। মাঝপথে যোগ দেন দেওয়ান সিং। নিজের ডিউটি কামরার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশে বলেন—ওদিকে নয়—এদিকে। তার নির্দেশ পালন করে না কেউ।

অফিসের বারান্দায় কেশবকে শুইয়ে দেওয়া হয়। রুমাল ভিজিয়ে জলের ছোপ দেওয়া হয় মুখে মাথায়। ফোনে অ্যাম্বুলেন্সের ডাক পড়ে।

কোলাহল শুনে বেরিয়ে আসেন মেজর হেল্‌ডেন।

—কি হয়েছে?

দেওয়ান সিং-এর বীরদর্পী চেহারাখানা ভেজা বেড়ালের মতো।

—হুজুর, বড় বদমাশ—ভান করছে।

—হেই—কেন ভিড় করছ তোমরা সব?—ধমক লাগান হেল্‌ডেন।

এগিয়ে কেশবের কাছে যান। গায়ে বুটের খোঁচা দিয়ে বলেন, হেই, হেই—গেট আপ্—

কেশবের নাকে তখনও একবিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে।

পৃথ্বীশ সহ্য করতে পারে না।

—দেখতে পাচ্ছেন না, নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে—

একটু যেন বিব্রত হন হেল্‌ডেন। পরক্ষণেই উষ্ণচক্ষে বলেন—ভদ্রভাবে কথা বলতে জান না?

হয়ত ভয় পায় পৃথ্বীশ।

—দুঃখিত, স্যার।

—এদের লাইনে ফিরে যেতে বল, জমাদার সাব।

ফৌজে হুকুম মানতেই হবে।

কেশবকে ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে ফিরে আসে সবাই।

কথায় আছে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কিন্তু যে চক্ষুশূল তার লাঞ্ছনাও তৃপ্তিদায়ক।

কতকগুলো শিক্ষিত ছেলেকে অকারণ উৎপীড়ন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন দেওয়ান সিং। তেমনি বেদনা বোধ করেছেন বৃদ্ধ সুবেদার হেডক্লার্ক ভার্মা। অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জমাদার দেওয়ান সিংকে তিরস্কার করেছেন হেল্‌ডেন।

সংবাদটা পাওয়া যায় অফিসের সেই সান্যালবাবুর কাছ থেকে।

হেড-কোয়ার্টার প্লাটুনের দুটো ব্যারাকে আবার খুশী ঢেউ খেলে। আহার-পরবর্তী বিশ্রামের কয়েক ঘণ্টা সবার মুখে মুখে ঐ এক আলোচনা। হাবিলদার দেওকীনন্দনের আবির্ভাব ঘটেছিল মাত্র একবার। বাঁকা চোরা খিস্তিখেউড়ের লক্ষ্য থেকে সে বহির্ভূত নয় বুঝতে পেরে সরে গেছে।

আনন্দ নেই এগারো নম্বর টোলির জোয়ানদের মুখে। ১১১° ডিগ্রি উত্তাপে উন্মুক্ত সূর্যালোকে সোওয়া মাইল ডাবল মার্চ করেও যারা হাসপাতালে যায় নি—জীবন-মৃত্যুর মাঝপথে তারা এসে ঠেকেছে। ঘণ্টাখানেক ধরে জলের পাইপের নীচে বসেও শরীর শীতল হয় নি। শুকনো খরখরে রুটি গলা দিয়ে নামে নি। ঘটি ঘটি জল খেয়েও বুকে মরুভূমির জ্বালা নিভছে না। সমস্ত শরীর ভিজে চাদরে জড়িয়েও মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে।

শরীর নাড়াতে পারে না প্রদ্যুম্ন। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। নিশ্বাস আগুনের মতো উষ্ণ। তিনটে নাগাদ অনুভব করে, গায়ে জ্বর এসেছে। কিন্তু

কাকে বলবে? মড়ার মতো পড়ে আছে এগারো নম্বর টৌলির সব ক'জন। চৌদ্দ নম্বর টৌলির জয়ন্ত সেন জল এনে বারান্দায় মাথাটা ধুয়ে দেয়।

এগারো নম্বর টৌলির যাই ঘটুক, আট নম্বর ব্যাটালিয়নের জীবনপ্রবাহে ছেদ পড়বার উপায় নেই।

পাঁচটায় ফল্-ইন্-এর বাঁশী যথারীতি বাজে। ব্যারাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ছুটাছুটি করে সব বেরোয়। বেরোয় না এগারো নম্বর টৌলির কেউ।

কর্কশ খাদে দেওকীনন্দনের বাঁশী ঘন ঘন আহ্বান জানায়। অবহেলা করতে অনেকেই ভয় পায়। এগারো নম্বর টৌলিরও জনা-কয় ফল্-ইন্-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

—এগারো নম্বর টৌলির বাকী জোয়ান কই?—চেঁচিয়ে ওঠে দেওকীনন্দন।

কেউ জবাব দেয় না।

বীরদর্পে ব্যারাকে আসে দেওকীনন্দন।

দরজার সম্মুখে প্রত্যুম্নর খাটিয়া।

—কোন্ লাটসাহেবের বাচ্চা শুয়ে আছে এখনও—

প্রত্যুম্নর মগজে কে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।

—ফের বাপ তুলবে তো মুখে জুতো মারব শালা—।

উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসে প্রত্যুম্ন।

একটু যেন হকচকিয়ে যায় দেওকীনন্দন।

—গালি ঝাড়ছ? সকালবেলা ডাবল-আপ করেও লজ্জা হয় নি—!

—চুপ্ রাও—

শুয়োরের মতো গোঁ গোঁ করে বেরিয়ে যায় দেওকীনন্দন। সোজা চলে যায় জমাদার সাহেবের ডিউটি-রুমে।

খান দুই চারপাই ব্যবধানে শুয়ে আছে পৃথ্বীশ। দেওকীনন্দনের ক্রোধের গুরুত্ব বোধহয় তাকে ভাবিত করে তোলে।

—তুইও মাথা গরম করলি প্রত্যুম্ন—

—আমার মাথার ঠিক নেই, ভাই!

সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে প্রত্যুম্ন।

একেলা প্রত্যুম্নর নয়, ব্যরাকের ভিতরে যারা শুয়ে আছে, আর যারা গিয়ে

লাইনে দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকের চোখে-মুখে দেওয়ান সিং-এর আবির্ভাবের উৎকণ্ঠা। নির্যাতনের আবার কোনো অভিনব খেলা শুরু হবে সেই চিন্তায় যেন কারো মুখে কোনো কথা নেই।

দেওয়ান সিং আসেন না। আসেন হাবিলদার মেজর আবদুল হামিদ।

—চল জমাদার সাহেবের সামনে।

—হেঁটে আমি যেতে পারব না। স্ট্রেচার নিয়ে এসো।

—আলবৎ পারবে।

—আমি বলছি পারব না। ইচ্ছে হয় কাঁধে করে নিয়ে যাও।

—জান কি সাজা হবে তোমার। ভেবো না, সুব্রতর মতো ছাড়া পেয়ে যাবে।

—যা হয় হবে। চেঁচিও না।

চিৎকার না করে অন্ততঃ এরা কথা বলে না। সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠবার জন্যই যেন প্রস্তুত হচ্ছিল আবদুল হামিদ। অনন্ত এসে মাঝখানে কথা বলে।

—জ্বরে বেচারার মাথা ঠিক নেই সাহাব।

—মাথার ঠিক নেই, পা তো ঠিক আছে। হেঁটে যেতে পারবে না কেন?

—মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেলে সেটা কি ভালো হবে?

—ওকে আলবৎ যেতে হবে।

—যদি কেউ বলে হেঁটে যাবার তার শক্তি নেই—প্রশ্ন করে কল্যাণ।

—হুকুম আগে। সে বাঁচে মরে যায়-আসে না।—জেদ ধরে আবদুল হামিদ। চারদিকে তাকায়।—চারজন ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নাও।

তুলে নেয় চারজন। প্রদ্যুম্ন প্রতিবাদ করে না। জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য ক্রোধ তার মধ্যে আরও কিছু আগুন ঢেলে দেয়। এইবার যেন সে ফেটে যাবে।

জমাদার দেওয়ান সিং-এর ঘরে মেঝের উপর বসে পড়ে প্রদ্যুম্ন।

—কার হুকুমে বসেছ?—চেঁচিয়ে ওঠেন আবদুল হামিদ।—দাঁড়াও—অ্যাটেনশান।

সুনীল সঙ্গে এসেছিল। সুপারিশ করে—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, জমাদার সাহেব। বসেই থাক না।

—তুমি চুপ কর।—ধমক লাগান দেওয়ান সিং। প্রদ্যুম্নর দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু বলবার আছে তোমার ?

—আছে অনেক। সেজন্য তো ডাকেন নি। কেন ডেকেছেন সেইটাই আগে শুনে নিই।

—হাবিলদার দেওকীনন্দনকে তুমি গালি দিয়েছ ?

—সে আমাকে বাপ তুলে গালি দিয়েছে।

—কখ্খনো না।—প্রতিবাদ করে দেওকীনন্দন।

—আমার সাক্ষী আছে।

—তুমি তাহলে তাকে গালি দিয়েছ ?

—তাই কি সে প্রমাণ করেছে ?

—প্রমাণ করবার দরকার নেই। আমি তাকে বিশ্বাস করি।

—আর আমি বলছি আমার সাক্ষী আছে।

—বাজে কথা। তোমরা সব জোট পাকিয়েছ। মঙ্গল চাও তো এখনও অপরাধ স্বীকার কর।

—আমি কচি খোকা নই।

—খুব সেয়ানা। সব গোলমালের তুমিই হচ্ছ রিং-লীডার। কোর্ট-মার্শাল না হলে তোমার শিক্ষা হবে না।

—হ্যাঁ, আমি কোর্ট-মার্শাল চাই। আমি আপনাকে মানি না। একজন রোগীর উপর জুলুম করবার কোনো অধিকার নেই আপনার। আমি আপনার নামে নালিশ জানাতে চাই।

এক লহমায় সবগুলো কথা বলে থামে প্রদ্যুম্ন।

—চুপ্রাও বে-তামিজ !—আক্রোশে ফেটে পড়েন জমাদার দেওয়ান সিং।

—আমাকে গালি দিচ্ছে। তোমরা সব সাক্ষী।

জয়ন্ত প্রভৃতি যারা তাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই।

এতক্ষণে বোধহয় জমাদার সাহেবের হুঁস হয়।

—তামাসা দেখছ তোমরা ? প্যারেডে যাও।

জয়ন্ত ইতস্তত: করে বলে—একে ব'য়ে লাইনে নিয়ে যাব স্যার ?

জমাদার সাহেবকে জবাব দেবার সুযোগ দেয় না প্রদ্যুম্ন।

—আমাকে একটু ধরে মেজর সাহেবের অফিসের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যা, ভাই!

—হুকুম শোন নি তোমরা।—চেঁচিয়ে ওঠেন জমাদার সাহেব।—না, আক্কেল সেলামী চাই। বেরিয়ে যাও—তুরন্ত—ডাবল-আপ।

বিনা বাক্যব্যয়ে চারজন ট্রেনী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

জয়ন্ত, বিশ্বেশ্বর, শুভেন্দু ওরা যখন সেদিন জমাদার সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল প্রত্যুম্ন। জমাদার হাবিলদার মিলে হয়ত কোনো নতুন ষড়যন্ত্র ফাঁদবে তার বিরুদ্ধে।

কোনো ষড়যন্ত্র হয় নি। স্ট্রেচার ডেকে তাকে পাঠানো হয়েছে হাসপাতাল।

সেই অপার করুণার জন্য কাকে যে সে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পায় নি। মনে হয়েছিল বাইরে এরা কাঠিন্যের আবরণ পরে। কিন্তু ভয় ও করুণা এই মানবিক দুর্বলতাগুলো ওদের নিঃশেষ হয়ে যায় না।

মুমূর্ষু অবসন্নতা থেকে রোগমুক্ত ভাবনা নূতন গতিপথ পায়। এই চার সপ্তাহের রঙরুট-জীবনে করুণা সে দেখে নি। অশোভনতার সাম্রাজ্য যেন এই আট নম্বর ব্যাটালিয়ান। এখানে মানুষের ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে নিয়ে মানুষ জুয়া খেলে। ন্যায়ের প্রার্থনা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে অন্যায়ের বেদীমূলে আত্মহত্যায় শেষ মুক্তি লাভ করে। এখানে কেউ হাসে না। শ্লেষ, বিদ্রূপ আর কদর্য অশ্লীলতার বিচিত্র অভিসন্ধিতে হাসির ছদ্মবেশে বর্ণালি নিষ্ঠুরতা যেন ঠিকরে পড়ে।

হাসপাতালের অলস শয্যায় একান্ত নিঃসঙ্গে প্রত্যুম্ন অনুভব করে, তাকে দয়া করে নি দেওয়ান সিং। তাকে ঠকিয়েছে। ১০৪° ডিগ্রি জ্বরের রোগীকে হাস-পাতালে না পাঠিয়ে নাজেহাল করবার অভিযোগ থেকে নিজেকে খালাস করেছে।

হয়ত এ শুধু তার অনুমান। এবং অনুমান মাত্রই অভ্রান্ত নয়।

তবু দেওয়ান সিং, আবদুল হামিদ, দেওকীনন্দনের কঠিন মুখ চোখের উপর ভাসে। তাদের রূঢ় ব্যবহার সমস্ত সত্তায় ক্ষুব্ধ আবর্ত তোলে।

অথচ ফিরে যেতে হবে।

হিট্-একজশান, হিট্-ফিভার, স্যাণ্ড-ফ্লাই ফিভারের পুরো মৌসুম। হাসপাতালে রোগী ধারণের স্থান নেই। বারান্দাগুলো খসখসে ঢেকে টেম্পোরারি বেড লাগানো হয়েছে। সেখানে পাখা নেই। রুদ্ধ বাতাস। গুমোট গরমে রোগীরা রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

প্রত্যুম্ন ভাগ্যবান। ওয়ার্ডের ভিতরে বেড পেয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের মেয়াদ হয়ত আর কয়েক ঘণ্টা।

মাদ্রাজী নার্স টেম্পারেচার নিচ্ছেন। প্রত্যুম্নর মুখেও থারমোমিটার গুঁজে দেন।

—৯৮'২°,—মোশান ?

—একবার।

—তাহলে ভালো হয়ে গেছ।

—না। খুব দুর্বল—

—দুদিন রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকে কি আজ ছাড়িয়ে দেবে সিস্টার ?

—তাই নিয়ম।

—দু-চারদিন থাকা যায় না ?

—এটা কি হোটেল ?

—শুনেছি হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাবার ছুটি পাওয়া যায়।

নার্সটি হেসে ফেলেন। চারদিন হাসপাতালে থেকে বাড়ি যাবার ছুটি ! —আশ্চর্য—

—যদি দয়া করে—

প্যানট্রির দোরের কাছে অপর একজন নার্সিং সিস্টার আবির্ভূতা হয়েছেন। তন্বী ইংরেজ মহিলা। এদিকে আসছেন। মাদ্রাজী নার্সটি কৌতুকের কণ্ঠে বললেন—একজন মজার রোগী দেখুন, সিস্টার। দুদিন হাসপাতালে থেকেই বাড়ি যেতে ছটফট করছে।

সিস্টার এগিয়ে আসেন। ঠাট্টার সুরে বলেন—ঘরে বুঝি কচি বৌ আছে ?

—না।

—ফিয়াঁসে ?

—ওসবের বালাইও নেই।

—তাহলে ?

প্রদ্যুম্ন ভাবে বলে ব্যাটালিয়ানের নির্যাতনের কথা। এই শেষ ভরসা। কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয়।

সিস্টার মেডিক্যাল হিস্ট্রি-শীট তুলে নেন।

—তুমি বোস—বাঙালী ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় দেশ ? ঢাকা ?

—না, ফরিদপুরে। ঢাকার সীমানায়। ঢাকা আপনি কি করে জানেন ?

—আমিও বোস। বাবার কাছে শুনেছি তাঁর দেশ ছিল ঢাকা।

—ঢাকায় আমাদের বিস্তর আত্মীয়স্বজন।

—ঢাকা আর গ্লাসগো দুই আমার কাছে এক। কখনও চোখে দেখি নি।

—আপনার বাবা বুঝি কখনও দেশে যান নি ?

—আমার এগার বছর বয়স হবার আগেই বাবা মারা গেছেন।

—কোথায় বাড়ি ছিল ?

—জানি না।

—আপনার মা নিশ্চয় জানেন।

সিস্টার বোসের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। এই ভাবান্তরে প্রদ্যুম্ন কুণ্ঠিত হয়।

হঠাৎ সিস্টার বোস সুমুখ থেকে সরে যান। অনুরোধ জানাবার সুযোগ আর হয় না।

বেলা আটটায় ওয়ার্ড-ডাক্তার কেস-শীটগুলো দেখতে শুরু করেন। খর্বাকৃতি লোক। কোন প্রদেশবাসী বুঝা যায় না। তবে বাঙালী নন।

নৈরাশ্যে মন ভেঙ্গে যায়।

মাদ্রাজী নার্স রোগীদের ঔষধ খাওয়াচ্ছেন। সিস্টার বোস ঘুরছেন ডাক্তারের সঙ্গে। একবার মাত্র এদিকে এসেছিলেন। কুণ্ঠায় ডাকতে পারে নি প্রদ্যুম্ন।

ডাক্তার আসছেন। এবার তার পালা।

—৯৮° টেম্পারেচার। সেরে গেছে। ডিসচার্জ হবে।

—স্যার, শরীরে জোর পাচ্ছি নে। আরও দু-চারদিন হাসপাতালে—কণ্ঠে গভীর আবেদন ফুটিয়ে তোলে প্রদ্যুম্ন।

—ননসেন্স—

প্রদ্যুম্নর কেস-শীটে লিখতে উদ্যত হন ডাক্তার।

—ও-থাক দু-চারদিন, ডক্। একে দিয়ে খাতাপত্তর আপটু-ডেট করিয়ে নেব।

—আপনি রাখতে চান ?—অদ্ভুত খুশীর হাসিতে বলেন ডাক্তার।

রেহাই পায় প্রদ্যুম্ন।

হাসপাতালের আহার দশটায়।

প্রদ্যুম্নর মিল্ক-ডায়েট।

এগারোটা নাগাদ ওয়ার্ড-সংলগ্ন সিস্টারদের ডিউটি-রুম থেকে তলব আসে।

সিস্টার বোস এবং মাদ্রাজী নার্স উভয়েই বসে আছেন।

—খাওয়া হয়েছে ?—সিস্টার বোস প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ।

—কাল থেকে কন্‌ভালসেণ্ট ডায়েট।

প্রদ্যুম্ন নীরব থাকে।

—হাসপাতাল কিন্তু আরাম করবার জায়গা নয়। হয় ব্যারাম নিয়ে থাকতে হবে, নয় কাজ নিয়ে।

—সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করছে।

—তার জন্য মৌখিক কৃতজ্ঞতাই বা জানালেন কোথায়।

সিস্টার বোস প্রদ্যুম্নর দিকে তাকান। দুটি চোখে কৌতুক খেলছে। হেসে ফেলেন। মাদ্রাজী নার্সটিকে উদ্দেশ করে বলেন—দেখলেন তো, সিস্টার সুভদ্রা। উপকারের জন্য ধন্যবাদটুকুও ইনি ব্যয় করতে চাইছেন না।

—হয়ত ভাবছেন নিজের গরজেই ওঁকে হাসপাতাল থেকে যেতে দেন নি। —চোখে মুখে মিষ্টি কৌতুক খেলে সিস্টার সুভদ্রার।

প্রদ্যুম্নর কান দুটো লাল হয়ে ওঠে।

সিস্টার বোস এতটুকুও কুণ্ঠিত হন না।

বলেন—আপনি তাই ভাবছেন নাকি ?

—না। অশেষ উপকার করেছেন। মুখের কথায় কতটুকু বা প্রকাশ করা যায়।

—আশা করি আপনার হৃদয় পূর্ণ হল, সিস্টার।—সকৌতুকে ফোড়ন কাটেন সিস্টার সুভদ্রা।

সিস্টার বোস গম্ভীর হন।

মোটামুটি ঘণ্টা-দুঘণ্টার কাজ। অ্যাডমিশান ডিসচার্জ রেজিস্টারে নতুন রোগীদের নাম-ঠিকানা তোলা। কেস্-শীট দেখে পুরানো রোগীদের ডিসচার্জ স্লিপ লিখে দেওয়া। কিছু ডায়েট-শীটের কাজ।

ডিউটি-রুমে বসে প্রদ্যুম্ন খাতা লেখে। সিস্টারদের বসবার ফুরসত নেই। রোগীদের ঔষধপথ্য, বিছানা-পোশাক পরিবর্তন। দেখাশুনা। অবিরাম ছুটাছুটি। সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডিউটি-রুমে চা খেতে আসেন উভয়েই। প্যানট্রি থেকে প্রদ্যুম্নর জন্যও এক কাপ চা নিয়ে আসেন সিস্টার বোস। তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসেন। দু-একটা কথাবার্তা। হাসি-ঠাট্টা। কিন্তু নিতান্তই কয়েক মিনিট।

প্রথম দু-তিনদিন অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত প্রদ্যুম্ন। সামান্য পরিহাসেও কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে উঠতো। অবজ্ঞা ও অপমানের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে থাকতো। কিন্তু স্নেহ না হোক, সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করছেন সিস্টার বোস। যতটা নয়, হয়ত তার চেয়ে বেশীটা সে কল্পনা করছে। দ্রুত সহজ হয়ে উঠেছে সে!

ধীরে ধীরে আরও নিবিড় ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে।

জীবনে নারীর সান্নিধ্য সে পায় নি। ঘনিষ্ঠতা ঐকান্তিক না হোক, সাধারণ সৌজন্যও কল্পনাকে বিমুখ করে না। অন্তরের প্রতীক্ষিত প্রত্যাশা পুষ্পিত হয়ে ওঠে।

সাতটা থেকে তিনটে অবধি সিস্টার সুভদ্রার ডিউটি। বারোটায় পালাক্রমে আধ ঘণ্টা লাঞ্চের ছুটি। এ সপ্তাহ এমনি চলবে।

দুপুরবেলা মাথার উপর বিজুলি-পাখা উষ্ণ হাওয়ার আলোড়ন তোলে। গায়ের জামা ঘামে ভিজে চুপসে যায়। সিস্টার সুভদ্রা মাথার উপর রঙিন ছাতা খাটিয়ে লাঞ্চ খেতে যান। সিস্টার বোস চেয়ার টেনে সুমুখে বসেন।

খাতার উপর কলমটা রেখে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন বোধ করে প্রদ্যুম্ন।

কি যেন ভাবেন সিস্টার।

মিনিটখানেক বাদে নিজেই মৌনতা ভঙ্গ করেন।

—আপনাদের সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এমন অদৃষ্ট—কোনো বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য কোনোদিন হল না।

—কখনও কলকাতা যান নি ?

—না। বাংলাদেশের ত্রিসীমানায় যাই নি। অথচ বাবার দিক থেকে আমি বাঙালী।

ওষ্ঠপ্রান্তে এক অদ্ভুত হাসি টেনে আনেন সিস্টার। বলেন—আপনাকে দেখে এক এক বার ভীষণ হিংসে হয়। আপনি বোস পদবীর সঙ্গে পুরুষানুক্রমিক ট্র্যাডিশানও পেয়েছেন। আর আমি যেন হাভাতের মতো কুড়িয়ে পেয়েছি।

—এর জন্য আপনি দায়ী নন।

—দায়ী যেই হোক, কি বিরাট গরমিল। ভাবলে নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহিও কম করতে হয় না।

—সংসারে যা বাস্তব সত্য, তাকে স্বীকার করে নিলেই জবাবদিহির দায় থাকে না।—সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে প্রত্যুম্ন।

সিস্টার বোসের কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না।

কেমন যেন এলোমেলো হয়ে উঠেছেন সিস্টার। বাইরে দুরন্ত রোদ্দুর। ওয়ার্ডের বিছানায় মানুষগুলো নিঝ্ঝুম মেরে পড়ে আছে। এখনও লু বইতে শুরু করে নি। গাছের পাতাগুলো স্থির। ওয়ার্ড-সংলগ্ন সাধারণ রাজপথে একটি প্রাণীও নেই। মাথার উপর তৈলহীন পাখা আর্তনাদ করছে। ক্লান্ত দুপুর ওয়ার্ডের ডিউটি-রুমে নিভৃত হয়ে উঠেছে।

বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন সিস্টার বোস। টেবিলে বাহুর উপর মাথাটা ধীরে ধীরে এলিয়ে দেন।

ভিতরের কোনো প্রেরণায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন।

বাবা এঞ্জিনিয়ার। মা গ্ল্যাসগোর মেয়ে। বিলেতে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে এদেশে আসেন। শৈশবের অনেকগুলো বছর কেটেছে কানপুরে। যখন বছর এগারো বয়স, পাঞ্জাবে কোন ব্রিজে কাজ করতে গিয়ে কয়েক ঘণ্টার জ্বরে বাবা মারা যান। বছর তিনের মধ্যে এক ইংরেজ টুরিস্টকে বিয়ে করে মা পাড়ি দিলেন বিলেতে। তাঁকে রেখে গেলেন এক অনাথ-আশ্রমে।

মায়ের চিঠি ক্বচিৎ কদাচিৎ এখনও পান। যত দূরেই হোক, আপন বলতে কেউ আছে, এ কথা ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু বাবার দেশ, গ্রাম—কে আছে, কে নেই—মাও সঠিক আর স্মরণ করতে পারেন না।

জীবনের অনেকগুলো পাতা প্রত্যুম্নর কাছে মেলে ধরে মন থেকে যেন একটা বোঝা নামান সিস্টার বোস।

সপ্তাহ শেষ হয়েছে।

শেষ হয়েছে এগারো নম্বর টৌলির শিক্ষা জীবন।

রবিবারের ছুটিতে পারমিট নিয়ে দেখা করতে আসে অনন্ত, কল্যাণ, পৃথ্বীশ।

তাকে অভিনন্দন জানায়।

—তুই লাকি। এক-হপ্তা ট্রেনিং ফাঁকি। পোস্টিং পেলি ভালো জায়গায়।— বৃটিশ মিলিটারি হাসপাতাল, এলাহাবাদ।

—খবরটা বলেছেন মেন অফিসের সান্যালবাবু। কিন্তু বলেছেন চাউর না করতে।

কল্যাণ, পৃথ্বীশ যাচ্ছে ফিল্ড-অ্যাম্বুলেন্স, মীরাট। অনন্ত সুশান্ত অনিমেষ যাচ্ছে পূর্বাঞ্চল অভিমুখে। গন্তব্যস্থল এখনও জানা যায় নি। বাকীদের অনেকে যাচ্ছে করাচী। শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে যাবে পাই ফোর্সে।

—কেশব ?

—হাসপাতাল থেকে তিনদিনের 'অ্যাটেণ্ড সি' নিয়ে ডিসচার্জ হয়েছিল। শেষ দুদিন প্যারেডে যেতে হয়েছে।

—কেশব যাচ্ছে সম্ভবতঃ আগ্রায়।

কানের কাছে হঠাৎ মুখ নিয়ে আসে কল্যাণ।

—এখানে খবরের কাগজ পড়তে পাস ?

—না।

—শহরে চায়ের দোকানে আজকের কাগজ দেখে এলাম। এক ভদ্রলোকের মুখ থেকেও অনেক কিছু শুনে এলাম।

সাংঘাতিক ব্যাপার সব ঘটে যাচ্ছে। গান্ধীজী বলেছেন, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ভারত-আক্রমণে জাপানকে প্রলুব্ধ করেছে। বলেছেন, কুইট ইণ্ডিয়া। আলাপ-আলোচনার পথ শেষ। এবার আরম্ভ হবে গণ-অভ্যুত্থান।

ছাইয়ের মতো প্রদ্যুম্নর মুখখানা সাদা হয়ে ওঠে। ঘন ঘন নিশ্বাস বয়। ভাবতে পারে না কোন পক্ষে সে।

কল্যাণ বলে, লাগুক, দেখিস দল পাল্টে নেব।

পৃথ্বীশ ফিসফিস করে বলে—চুপ, চুপ। হিন্দুস্থানীগুলোও আজকাল বাংলা বোঝে।

সোমবার থেকে নাইট-শিফটে আসবেন সিস্টার বোস। আজ অফ-ডিউটি। হঠাৎ দরজায় আবির্ভূতা হন। সবুজে লালে লতাপাতা ফুল আঁকা ব্লাউজে অপূর্ব মানিয়েছে। চুল উস্কোখুস্কো। সমস্ত দেহে মন্থর সজীবতা। চোখে রক্তিমালস।

ঠাট্টা করে বলেন—বন্ধুর বাহুল্য ঘটেছে। আমার বোধ হয় ঠাঁই নেই।

—আপনার উপস্থিতি শ্রীসাধন করবে—প্রদ্যুম্ন বলে।

—তোমাদের অস্বস্তি ঘটাতে চাই নে। ছটায় আমার সঙ্গে শহরে যাবে?

বন্ধুদের উপস্থিতিতে প্রদ্যুম্নর কান-দুটো লাল হয়ে ওঠে। বিব্রতবোধ করে সে। কিন্তু সিস্টার বোসকে অমান্যও করতে পারে না। ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে অব্যাহতি পেতে চায়।

সিস্টার বোস চলে যেতেই অনন্ত মুখ খোলে।

—বেড়ে আছিস। জুটিয়েছিস মন্দ নয়। বয়সটাই যা কেবল তোর বড়দির সমান।

—সম্পর্কটাও যে তাই নয়, তার কোনো প্রমাণ পেয়েছিস?

—রেখে দে, রেখে দে। সম্পর্কহীন স্ত্রী-পুরুষে দুটি সম্বন্ধই চলে। ঠাকুমা, না-হয় প্রেমিকা। তোর মতো একটা ধেড়ে ষাঁড় দেখে নিশ্চয় ওর অপত্যস্নেহের ঢেউ জাগে নি।

কল্যাণ বলে—তাহলে তুই জামাই-আদরে আছিস। কিন্তু পোস্টিংটা ছাড়িস নে। দেরী করলে অন্য লোক পাঠিয়ে তোকে ঠেলবে ফিল্ড-অ্যাম্বুলেন্সে। অর্থাৎ আফ্রিকায়।

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত হয়। তাদের সন্দেহ অমূলক প্রতিপন্ন করতে জোর দিয়ে বলে—দেখিস। কাল বিকেলে গিয়েই হাজির হচ্ছি।

ছটায় আহারের টাইম। অনন্তরা ওঠে।

ওয়ার্ডের দক্ষিণ দিকের বারান্দা পার হয়ে একফালি জমি। এক বুক উঁচু

পাঁচিলে ঘেরা। অপর ধারে রাস্তা। পাঁচিলের কোল ঘেঁসে মহুয়া-শিশু-পলাশের সারি। গোড়া আশ্রয় করে অনায়াসে পাঁচিল টপকানো যায়। সন্ধ্যার পর অনেক রোগী ঐ পথে হাওয়া খেতে বেরোয়। কেউ বা মোড়ে নেপালী চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসে। আর যারা অতি সাহসী, শহর ঘুরে সিনেমা দেখে ফিরে। অবশ্য তার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়। নার্সিং-অর্ডালির সঙ্গে। অনুপস্থিতি সে চেপে রাখে।

রঙরুটদের মাজরী পোশাক। হাসপাতালের ধুবীর কল্যাণে পারিপাটি করে ধোওয়া। ফিটফাট তৈরী থাকে প্রদ্যুম্ন।

ছটায় সিস্টার বোস আসেন। রঙের প্রলেপে মুখের জৌলুস বেড়েছে। গাউনে মহার্ঘ্য বর্ণাঢ্যতা। চুল এইমাত্র যেন পরিপাটী করে এলেন। কিন্তু সমস্ত দেহে ঝিমিয়ে পড়া ভাব।

—ডিউটী সিস্টারকে বলেছি। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। আমি মেন গেট দিয়ে আসছি।

ইঙ্গিতে দেওয়াল টপকে যেতে নির্দেশ দেন সিস্টার।

প্রদ্যুম্নর রক্তে ঢেউ ওঠে।

মিনিট দুতিনের মধ্যে সিস্টার বোসের টাঙ্গা প্রদ্যুম্নর পাশে এসে দাঁড়ায়।

প্রদ্যুম্ন উঠে পাশে বসে।

—তোমার কোনো সিভিলিয়ান শার্ট নেই?

সিস্টার বোসের মুখে সেই উৎকট গন্ধ। একদিন রাত্রে অনন্তর মুখে যে গন্ধ পেয়েছিল। সমস্তই হঠাৎ যেন বিস্বাদ হয়ে যায়। সংশয়ে দোদুল্যমান। কিছুই ঠিক করতে পারে না।

জবাব দেয়—ব্যাটালিয়ানে আছে।

—তাতে কি লাভ। এই মাজরীগুলোকে দুচোখে দেখতে পারি নে। ফলোয়ারদের মতো দেখায়।

অপরাহ্নের ম্লান আলোয় সিস্টার বোসের মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে প্রদ্যুম্ন। কিছু বুঝা যায় না। খুশীর যে সহজ ঔজ্জ্বল্য সে প্রত্যাশা করেছে, কেবল তাই নেই।

যেন সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিতভাবে খাপছাড়া হয়ে পড়েছে। একটা জবাবদিহির দায় পাড়ে।

—আপনার বোধ হয় অস্বস্তি লাগছে, সিস্টার।

—আমি কি তাই বলেছি?—যেন ধমক দিয়ে ওঠেন সিস্টার বোস।

একটু থেমে বলেন—আমার নিজের দিক থেকে এতে কিছু আসে যায় না, প্রদ্যুম্ন। পরিচিত কেউ দেখলে ভাববে নজরটা খুব নীচু।

প্রদ্যুম্ন বোকার মতো হাসে। কিন্তু মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। অপরের ভাবনা নিয়ে যে সংঘাত নিজের মনেতেই, তার অন্তর্গূঢ় স্বীকৃতি। প্রদ্যুম্নর বুঝতে ভুল হয় না। সিস্টার বোসের মনে সেই দ্বন্দ্ব।

মদের উগ্র গন্ধ আর এই সংকীর্ণতা মিলে প্রদ্যুম্নর সমস্ত খুশী যেন পালিয়ে যায়।

—তুমি বলেছিলে ঢাকায় তোমার অনেক আত্মীয়-স্বজন। তাদের লিখলে বাবার গ্রামের হদিশ পাওয়া যায় না প্রদ্যুম্ন?

—দীর্ঘ বিশ-বাইশ বছর পর তাঁর কথা লোকে ভুলে যায় নি সিস্টার?

—ভুলে নাও যেতে পারে। বিলাত ফেরত তো আর এদেশে অনেক হয় না।

—হয়ত আমি সবাইকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু তাঁরা যে দয়া করে অনুসন্ধান করবেন কিংবা চিঠি দিয়ে জানাবেন তার ভরসা কত?

রাস্তার বিপরীত দিকে তাকিয়ে আছেন সিস্টার। তাঁর মুখ দেখা যায় না। মিনিট দু-তিন কি যেন ভাবেন। বলেন, তোমাকে যদি মাসখানেকের হসপিটাল লিভ করিয়ে দিই। কিন্তু কথা দাও তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করবে?

রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। লক্ষ্ণৌর ধূলি-ধূসরিত রাজপথ সন্ধ্যা-উত্তর আবছা আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে।

—তাতে কি লাভ?—ম্লানহাসির প্রয়াসে প্রদ্যুম্ন বলে।

—অনেক। আমি অনাথ-আশ্রমে মানুষ। কিন্তু আমার বাবা নিশ্চয় নিঃস্ব ঘরের ছেলে ছিলেন না। তাঁর বিষয়-আশয় হয়ত অপরে ভোগ করছে। আর বিশ্ব-সংসারে আমার তো কোনো আশ্রয় নেই!

তীক্ষ্ণ বৈষয়িক ভাবনা! প্রদ্যুম্ন চুপ করে থাকে।

—কি ভাবছ বল তো?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল প্রদ্যুম্ন। হঠাৎ যেন সজাগ হয়।

—বেগ পারডন—

—তুমি কিছু শুনছ না। মিথ্যে আমি বকবক করে মরছি।—কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রুক্ষ।

—বিশ্বাস করুন সিস্টার। কোনো উপায় করা যায় কিনা আমি তাই ভাবছিলাম।

সিস্টারের চোখে মুখে হয়ত খুশী ঝলসে ওঠে। অন্ধকারে তা দেখা যায় না। প্রদ্যুম্নর ডান হাতখানা চেপে ধরেন।

—ইউ আর সো ডার্লিং!

তড়িৎস্পর্শ! দেহের প্রতি অণুতে পুলকের চঞ্চলতা। সমস্ত আকাশে যেন স্বপ্নের তরঙ্গ।

প্লাজা সিনেমার অত্যুজ্জ্বল আলোকে টাঙ্গাখানা থামে।

প্রদ্যুম্ন নামে। সিস্টার বোসকে হাত ধরে নামায়।

আজ আসর-জমানো বই। বি.ও.আর.দের কিউ লেগেছে টিকিটঘরে। রাস্তার ওপারে খানকয় গাড়ি। লরী এবং মিলিটারি স্টাফ-কার।

সিঁড়ির মাথায় বারান্দায় নাটুকে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন জনৈক ইংরেজ সামরিক অফিসার। দূরে থেকে কাঁধের তারকাগুলো বোঝা যায় না।

সিস্টার বোসের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

অফিসারটি কয়েক ধাপ নেমে আসেন। সিস্টার বোসের মুখোমুখি দাঁড়ান।

—কত সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এই সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ হল, সিস্টার।

কাঁধে একটা ক্রাউন।

প্রদ্যুম্ন ভয়ে আড়ষ্ট।

মধুর সৌজন্যে আকর্ণ মুখব্যাদন করেন সিস্টার বোস।

—আশা করি আপনার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হব না।

সহসা জবাব দিতে পারেন না সিস্টার। আড়চোখে প্রদ্যুম্নর দিকে তাকান।

কিন্তু কটমট করে তাকান মেজর সাহেব।

—এই আজব জীবটা কে?

—আমার ব্যাটম্যান।

বাম বাহুখানা সিস্টারের দিকে প্রসারিত করে দেন মেজর।

আলতো হাতখানি রেখে এগিয়ে যান সিস্টার বোস।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন।

তার শেষ সম্বল একাওয়ালাকে পারানি দিয়ে এক পরম উপলব্ধি নিয়ে ওয়ার্ডে ফেরে প্রদ্যুম্ন।

ফৌজে মানুষের কোনো মূল্য নেই। মূল্য র‍্যাঙ্কের।

কাঁধের উপর তারকা কিংবা রাজমুকুট। পদাধিকারের দম্ভের পায়ে মনুষ্যত্ব যদি লুটিয়ে পড়ে, মানুষের প্রেম তার ব্যতিক্রম পথে চলবে কেন? প্রেম সে কাব্যে পড়েছে। অন্তরের মাধুর্য ও মহত্ত্ব নিঙড়ে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু বিত্ত ও দেহ দিয়ে পরিমাপ করে নি।

অন্ধকার রাস্তায় অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মধ্যে এক নূতন জীবনবোধের প্রান্তে যেন সে পৌঁছায়। প্রেম ও দেহের মধ্যে যে চিরন্তনী সম্পর্ক কোনো অতি বাস্তব নীতিবাদের অলৌকিক সত্য তার বেদনাকে কাব্যলোকে উত্তীর্ণ করে দেয় না। বস্তুগত পাওয়া না-পাওয়ার হাসি-কান্নায় জীবনের যে প্রকাশ সেই সত্য অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। সেই সত্যের বিচারে প্রেম দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করে অন্তত পৃথিবীর মাটিতে বাঁচে না।

পাঁচিল টপকে শ্রান্ত ক্লান্ত একটা মানুষ ওয়ার্ডে ফিরে আসে। তার সমস্ত অঙ্গে যেন হৃদয়হীন ছলনার অশুচি।

নিদ্রাহীন উত্তপ্ত রাত্রির উজ্জ্বল তারাগুলোর চোখে চোখে পলাতক ইশারা।

সকালেও বিক্ষুব্ধ গ্লানির অন্তর্দাহ। সমস্ত ওয়ার্ড যেন শ্লেষ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই গুমোট পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে মন অস্থির।

হপ্তা-শেষে নতুন ডাক্তার এসেছেন। সিস্টার বোসের নাইট-ডিউটি। সিস্টার সুভদ্রাও নেই। একটা সুস্থ মানুষের আবেদন গ্রাহ্য করে তাকে বিদায় দিতে ডাক্তারের দ্বিধা হয় না।

নটা বাজবার আগেই আট নম্বর ব্যাটালিয়ানের লাইনে ফিরে আসে প্রদ্যুম্ন।

এগার নম্বর টোলির আজ প্যারেড নেই। আজ কিট ইন্সপেক্শন। দশটায় রঙরুটদের মাজরী পোশাক স্টোরে জমা হবে। বদলে পাবে নূতন খাকী

উর্দি, হাবিলদারের বিল্লি আঁটা। তা ছাড়া সৈনিকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম।

এগার নম্বর টোলির ট্রেনিরা উল্লাসে কলরব করে তাকে ঘিরে ধরে। ক'দিন আগে কেশবকেও এমনি অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল।

অনন্ত ঠাট্টা করে বলে—সুখের নীড় ছেড়ে আসতে বুক ফেটে যায় নি তো ভাই?

তীব্র অপমানবোধ প্রদ্যুম্নর মনে এক ছোপ কালি ঢেলে দেয়। তবু সে প্রতিবাদ করে।

—একটা রঙরুটের কত মান-মর্যাদা তুই কি জানিস নে অনন্ত?

—কবি বলেছেন প্রেম অন্ধ।

—ভাগ্যিস সেই কবি এযুগে জন্মান নি। নিজের ভুলের জন্য তাহলে নিজের চোখ দুটোকেই অন্ধ করে দিতেন।

—কেমন যেন ব্যর্থপ্রেমের গন্ধ পাচ্ছি।—খোঁচা দেয় পৃথ্বীশ।

—কোথায়? তোর মনে নয়তো?

অনন্তকে কিন্তু এত সহজে নিবৃত্ত করা যায় না।

—কাল ছুটার পর কোন স্বর্গে গেছিলে বাছাধন?

—মোট বইতে বাজারে।

—তুই একটা ননসেন্স—অনন্ত মুখ খিঁচোয়।—মোট বইবার ওর চেয় লোক আছে। গরজটা অন্য। এইটুকুও বুঝলি নে গাধা?

—তাহলে তুই একটা চান্স নে অনন্ত।—পৃথ্বীশ বলে।

—শালা ভাগ্যই আমার শত্রু। পাঁচটা হপ্তা লেফট-রাইট করলাম, একদিনও অসুখ হল না।

—আফসোস কেন, তোর তো সিতারি বাঈ রয়েছে—প্রদ্যুম্ন শ্লেষ করে।

অনন্ত অপ্রতিভ হয়, চোখ টিপে চুপ করতে বলে।

প্রদ্যুম্ন ক্ষান্ত হয়। কিন্তু চেপে ধরে কল্যাণ।

ব্যারাকের অপর প্রান্তে আবদুল হামিদের বাঁশী বাজে।

—এগার নম্বর টোলি উইথ কিট্ ফল্ ইন—

একটা ঘণ্টা এত তাড়াতাড়ি কেটে গেছে কেউ বুঝতেও পারে নি।

পরদিন পে।

অ্যাকাউণ্টস অফিসের লম্বা বারান্দায় স্ট্যাণ্ড অ্যাট ঈজ হয়ে দাঁড়ায় সব। ভিতর থেকে নাম ডাকা হচ্ছে। কুইক-মার্চ করে দাঁড়াতে হবে পে-টেবিলের সামনে। নিরক্ষর এবং শিক্ষিতের ব্যবধান নেই। বুড়ো আঙুলের ছাপ নেবে একজন। সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা হাতে গুঁজে দেবে আরেকজন। হাবিলদার মেজর হুকুম দেবেন—অ্যাবাউট টার্ন—কুইক মার্চ। গোনবার সময় নেই।

পে-প্যারেডের পর ছুটি। কিন্তু শহরে যাবার হুকুম নেই। হাতে টাকা পেয়ে পালিয়ে যায় যদি। ব্যাটালিয়ানের দায়িত্ব সতর্ক পাহারায় গাড়িতে তুলে দেওয়া এবং গাড়িতেও ছোট ছোট দল বেঁধে দেওয়া। উদ্দেশ্য একের অপরাধের কৈফিয়ত যদি অন্যের কাছে আদায় হয়।

আহারের পর টিনের সুটকেস হাতড়ে অনন্ত একজোড়া তাস বের করে। এক আনা স্টেক।

দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে গায়ে গামছা চাপা দিয়ে এগার নম্বর টোলির কেউ আজ ঘুমায় না। আজকে শেষদিন। কাল তারা ছড়িয়ে পড়বে বিশাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ভাগ্যের স্রোতে ভেসে যাবে হয়ত আরও দূরে। আফ্রিকা, ইরান, মণিপুর রোড, বাউলি বাজার অথবা পৃথিবীর কোন প্রান্তে কে জানে। জীবনে হয়ত আর দেখাও হবে না। মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়বে উড়োজাহাজ। মেশিনগান, ব্রেনগানের গুমগুম খটাখট শব্দ। মৃত্যুর তিমিরান্ধ সনদ। কেউ ফিরবে, কেউ ফিরবে না।

আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় তারা।

অনন্ত চায় উপভোগ করতে। মৃত্যুর আতঙ্ক জীবনকে উর্দিপরা আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে। তার ক্লিষ্ট পীড়া থেকে পেয়ালার ফেনায়িত বুদবুদে সমস্ত চেতনাকে সে তরল করে নিতে চায়। ক্ষণস্থায়ী হোক। তবুও সেই নেশার ঢিমেতালে সিতারি বাঈয়ের কণ্ঠে সৃষ্টি করবে মায়া-জগৎ। তার এক চুমুক বিষাক্ত উষ্ণতা দুর্বার জাদুতে তাকে আকর্ষণ করে।

সিতারি বাঈয়ের ব্যাপারটা না শোনা পর্যন্ত সেদিন রেহাই দেয় নি পৃথ্বীশ। কল্যাণও জেনেছে।

অনন্তর ঔৎসুক্য ; পৃথ্বীশের কৌতূহল ; আর কল্যাণের অ্যাডভেঞ্চার। আজকের দিনটিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় দূরাগত দিনের স্মৃতিতে তারা বেঁধে রাখবে।

প্রদ্যুম্নর আজন্মকালের সংস্কারে সংশয়। আপত্তি তোলে সে।

অনন্ত ঠাট্টা করে।

—তোর গার্জেনরা চকের মোড়ে দাঁড়িয়ে নেই। গান শুনবি, চলে আসবি। মনে পাপ না থাকলে পাপের পথে যাবি নে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা অবধি প্রদ্যুম্নর মন এলোমেলো। ব্যর্থ স্বপ্ন ও ঘৃণার সংঘাত। অপরিসীম ভালো-না-লাগা। তার হাত থেকে সে অব্যাহতি চায়। হোক না সিতারি বাঈয়ের সঙ্গীত।

অপূর্বও সঙ্গে জোটে।

আট নম্বর ব্যাটালিয়ানের চক্রব্যূহ থেকে বেরুবার পথ অনন্ত জানে। ধুবীখানার পিছনে তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যাওয়া যায়। সেই পথেই রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে যায় আবদুল হামিদ, রহমতুল্লা।

গভীর রাত্রে শহর থেকে ফেরেন দেওয়ান সিং।

ধুবীখানার প্রধান ঝণ্টুলাল। জুয়ার আড্ডার অনেক বকশিশ সে খেয়েছে অনন্তর হাত থেকে। রাত নটা থেকে বারোটা অবধি ডিউটিতে থাকবে খেওলনরাম। ঝণ্টুলালের হাতের লোক। ফিরবার পথে মাথা-পিছু আট আনা হাতে গুঁজে দিলেই ব্যস্।

চারপাইয়ে মশারি খাটিয়ে বেসামরিক পোশাকে বেরিয়ে যায় পাঁচজন।

চকের বিখ্যাত গলির মুখে আন্তর্জাতিক আউট-অব-বাউণ্ড লেবেল। লাল-ঝুঁটি পাগড়ী, মিলিটারী পুলিশ।

প্রদ্যুম্নর পা কাঁপে।

—জড়সড় হয়ে গেলি। বেটারা ঠিক টের পাবে।—উপদেশ দেয় অনন্ত।

কল্যাণের উত্তেজনাও স্তিমিত হয়ে আসে।

—রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হবে অনন্ত?

—এলি কেন?—অনন্ত ধমক দেয়।

আউট-অব-বাউণ্ড সাইন তারা পার হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় ঝুঁটি বাঁধা পাগড়ী আর দেখা যায় না।

তবু পা এগুতে চায় না। যেন শত্রুর ফাঁদের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। সরু রাস্তা। দুপাশে সারিবদ্ধ ইমারৎ। অধিকাংশই পুরানো। একে অপরকে লেপ্টে জড়িয়ে আছে। তাদের ভিতর দিয়ে গলে যাবার কোনো গলিপথ নেই।

ব্যাধের শানিত লোভ নিয়ে প্রতি অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে দেহপসারিনী। সুর্মা-টানা চোখে আদিম ইশারা। আর পশ্চাতে ক্রূর মিলিটারি পুলিশ।

প্রদ্যুম্ন পৃথ্বীশকে ধাক্কা দেয়।—কি নোংরা! চ ফিরে যাই।

—গান না শুনেই!

পৃথ্বীশেরও যেন নেশা লেগেছে।

পাশ কাটিয়ে চলে গেল দুজন। সাদা পোশাকে প্রথমে চিনতে পারে নি। ভয়ে প্রদ্যুম্নর বুক শুকিয়ে গেল। সুবেদার মোহন সিং না হোক, আবদুল হামিদ নিশ্চয় চিনেছে।

অনন্ত কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়।—বোকা কোথাকার। চোরের নামে চোরে কখনও থানায় ডাইরী লেখায়? দেখলে বরং কাল খাতির করবে।

—হ্যাঁ, খাতির করেই বলবে, উইথ কিট্ ডাবল আপ্—।

—শালার বাবার জমিদারী আর কি। এখন থেকে আমরাও পুরো হাবিলদার।

একটা অন্ধকার সিঁড়ির সামনে এসে ডাইনে বাঁয়ে অনন্ত চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ধাপে ধাপে উপরে উঠে যায়। সবাই তাকে অনুসরণ করে।

সিতারি বাঈয়ের বয়স হয়ত ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে। অঙ্গসজ্জায় ঊনবিংশতিনী। রূপ আছে। রমণীয়তা নেই। ঘরে মাইফেল বসেছে। বারান্দায় এসে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করে। অনন্তর সঙ্গে এক কোণে সরে যায়। ফিসফাস কথা বলে দুজনে। তারপর মেয়েটি ঘাগরার আন্দোলনে অপূর্ব লহরা তুলে ভিতরে চলে যায়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রদ্যুম্ন ভিতরে তাকায়। জাজিমের উপর চটকদার সুজনি পাতা। খানকয় তাকিয়া। মদের বোতল গ্লাস। একজন মাঝবয়সী লোক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। ঘুমিয়ে আছেন কি জেগে আছেন বুঝবার উপায় নেই। তার একপাশে মাদুরের বিছানায় সারেঙ্গী নিয়ে বসেছে এক সপ্ততিপ্রায় বৃদ্ধ। তবলার সামনে আরেকজন। তার বয়সও ষাট অতিক্রম করেছে।

বারান্দার অপর প্রান্তে আরও দুটি মেয়ে। বিলোল কটাক্ষে আহ্বান জানাচ্ছে। হাসি ও দৃষ্টিতে কদর্য অশ্লীলতা।

পুরানো বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধে বাতাস পীড়িত। চারিপাশে অপরিচ্ছন্নতা। হাজার হাজার বছরের অশুচি কীটাণু ইতস্তত কিলবিল করছে।

সিঁড়ির মাঝপথে এসে প্রদ্যুম্ন অন্তদের সামিল হয়।

—কি হল ?—প্রশ্ন করে।

—দেখছিস না ঘরে লোক রয়েছে। রহিস আদমী। নিশ্চয় মোটা টাকা ঝেঁকেছে।

—তাহলে ?—প্রশ্ন করে পৃথ্বীশ।

—চল না। আরেকটা ভালো জায়গা আছে।

রাস্তায় এসেই প্রদ্যুম্ন রুখে দাঁড়ায়।

—ফিরে চ অনন্ত।

—পাগল নাকি ?—

—আমি ফিরে যাবই।

—যা না। পুলিশের হাতে ধরা পড়গে। আনাড়ী কোথাকার।

প্রদ্যুম্নর জেদ চেপে ধরে।

—যাচ্ছি, অনন্ত।

অনন্তর দুচোখ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছুটাছুটি করছে। জবাব দেয়, মর্‌গে শালা।

শুভেচ্ছাটুকু শঙ্কা মাত্র বাড়ায়। কিন্তু জেদ থেকে হঠাতে পারে না।

কোনোদিকে না তাকিয়ে গলির মুখ সে পার হয়ে আসে।

বড়রাস্তার জৌলুস ঝিমিয়ে এসেছে। দু-একটা পানবিড়ির দোকান ছাড়া বাকী দোকান বন্ধ। লোকজনের চলাফেরা বিরল। চোখ-ধাঁধানো আলো নেই। লাইটপোস্টের স্তিমিত আলোয় চারিদিকের আলো-আঁধারি পল্লীটিকে আরও নিঝুতি করে তুলেছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে প্রদ্যুম্ন। কত রাত হয়েছে অনুমান করা সম্ভব নয়। জুলাই মাসের স্বচ্ছ আকাশে একঝাঁক তারা। রাত্রির বাতাস স্নিগ্ধ।

ভালো লাগে এই নিঃসঙ্গ চলা। অন্ধকার আঁচলে মুখ ঢেকে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এখন মুক্ত। চারিদিকে শূন্যতা। কোনোপ্রকার উৎপীড়নের ভ্রূকুটি নেই। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ষড়যন্ত্র নেই। উদার আকাশে তারকার চোখে চোখে অবাধ মুক্তি।

প্রদ্যুম্নর মনে হয় এই নির্জন মুক্তির মধ্যে বহু কল্প ধরে যেন সে একা একা চলে যেতে পারে।

অনেকটা পথ এগিয়ে আসে। অপরিচিত পরিবেশে নির্জন অন্ধকার তার

মনে ক্রমে ভীতির উদ্রেক করে। ঘরবাড়ির সংখ্যা কমে আসছে। আরও কিছুটা গেলে ফাঁকা মাঠ। তারপর ক্যাণ্টনমেণ্ট।

এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। প্রায় তিন মাইল।

দেব-কৃপার মতো একখানা এক্কাও পেয়ে যায়। দরদস্তুর করা চলে না। সিটের উপরে দেহখানা এলিয়ে দেয়। ঘুমোলে আরাম হতো। কিন্তু অপরিচিত দেশ। প্রবল চেষ্টায় চোখের পাতা বুজতে দেয় না।

বড়রাস্তা থেকে বাঁ-হাতি খাড়ি। এই পথে মাইলটাক গেলে সেই বিশেষ স্থান। যেখানে তাকে নামতে হবে। সেখানে মেঠো পথে আট নম্বর ব্যাটালিয়ানের ধুবীখানার পশ্চাতে ময়লা জল নিষ্কাশনের নালা আরও দু ফার্লং।

খাড়িপথে গাড়োয়ান গাড়ি ঘোরায়। দুপাশে শিশু, নিম আর শিরিষের সারিতে পথটা আরও নির্জন। আরও অন্ধকার। দীর্ঘতর ব্যবধানে দু-একটা ইলেকট্রিকের বাল্ব।

ঝিমিয়ে পড়েছিল প্রদ্যুম্ন।

মেয়েলী কণ্ঠের গোঙানি ভেসে আসছে।

চকিত হয় সে।

শব্দটার আরও কাছে গাড়ি পৌঁছায়। লাইট-পোস্ট অনেক দূরে নয়। অবসন্ন আলোয় তিনজন মানুষ। প্রায় ছায়ামূর্তি।

—দাঁড়াও।—প্রদ্যুম্ন হাঁকে গাড়োয়ানের উদ্দেশে।

গাড়ি দাঁড়ায়।

গাড়ির পাশে তড়িৎবেগে এসে দাঁড়ায় একজন গোরা সৈনিক। দীর্ঘদেহ। বেশবাস বিশৃঙ্খল। কাঁধে ব্রেনগান।

প্রদ্যুম্নর বুকের উপর গানটা উঁচিয়ে ধরে।

—নেমে এসো।—

ভয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা। নিশ্বাস যেন গলায় আটকে আসছে। কাঁপছে সমস্ত দেহ। বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে আসে প্রদ্যুম্ন।

নির্বিচারে গোরা সৈনিকটি তার পকেটে খানাতল্লাসী চালায়। সব টাকা সে নিয়ে বেরোয় নি। এগারো টাকা কয়েক আনা আছে পকেটে। নিঃশেষে আত্মসাৎ করে।

—এসো, জন। গাড়িটার সদ্ব্যবহার করি।

অন্ধকারে একটা নারীদেহকে দুবাহুতে আবদ্ধ করে যে মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের ছায়ায়, সে এবার এগিয়ে আসে। সবল আকর্ষণে স্ত্রীলোকটির প্রতিরোধ-চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মুখখানা প্রদ্যুম্নর চেনা-চেনা। খাবার সময় লঙ্গরখানার পাশে কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে যে কটি ভিখারী ভিড় করে দাঁড়ায়, নেচে হেসে গান গেয়ে এক-আধখানা রুটি প্রত্যাশা করে—এই স্ত্রীলোকটি হয়ত তাদেরই একজন। শুধু তাদের কেন, গোটা দেশের অগণিত ক্ষুধার্তেরই একটি। কুৎসিত চেহারা। বেঁটে, কদাকার। বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ, এমনকি ষাটও হতে পারে। চামড়ার নীচে কখানা হাড় ছাড়া শরীর বলে কোনো পদার্থ নেই। মাথার চুলে জট বেঁধেছে।

টেনে এনে এক্কার ওপর একরকম ছুঁড়ে ফেলে ভিখারিনীটাকে। দুপাশে দুজনে উঠে বসে। নির্জন মাঠে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেয়।

প্রদ্যুম্নকেও সাবধান করে যায়। চেঁচালে গুলী ছুঁড়বে।

প্রতিবাদে একটা শব্দও প্রদ্যুম্নর কণ্ঠ থেকে বেরোয় না।

অন্ধকারে এক্কাখানা অদৃশ্য হয়ে যায়।

যেন ছায়াচিত্রের ঘটনা। মুহূর্তে শুরু ও শেষ। কিন্তু শেষ হয় না অশেষ গ্লানি। গাছের ছায়াগুলো যেন এক-একটা ভয়ের রাজ্য। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ে প্রদ্যুম্ন।

অবশেষে পৌঁছায় ধুবীখানার পেছনে। পারানি নেই। প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে হয়ত কোলাহল করবে খেওলনরাম। ভিতরে যেতে সাহস করে না।

কিন্তু এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে সে রাত কাটাতে পারে না।

তাই অনন্তদের জন্য অপেক্ষা না করা ছাড়া উপায় নেই।

মাঠের মাঝখানে সে বসে পড়ে। অন্ধকার রাত্রি তাকে ঘিরে থাকে।

সময়ের পা যেন চলে না।

অনেক দূর থেকে ফিসফাস শব্দ আসছে।

আবার ভয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ছুটে পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু না। অনন্তর কণ্ঠস্বর।

নির্দেশ ছিল স্টেশনে নেমে আর.টি.ও.র কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তিনি স্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন।

সকাল পাঁচটায় ট্রেন পৌছায়।

আর.টি.ও.র আফিসে একজন বি.ও.আর. বসে চা খাচ্ছে। প্রদ্যুম্ন ভিতরে প্রবেশ করায় বিরক্ত হল সে। সমস্ত রাত জেগে সে ডিউটি দিয়েছে। আর কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে রাজী নয়।

সাতটায় আসবে ডে-ডিউটি স্টাফ। আসবেন অফিসার। তাঁদের কাছে আবেদন জানাতে হবে।

এই অপমানকর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না প্রদ্যুম্ন। ফৌজে এই জিনিসটাই যেন স্বাভাবিক। একমাসের ট্রেনিং জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করে এসেছে।

—যদি টাঙ্গা করে যাই।—

—স্বচ্ছন্দে।

টাঙ্গায় আরা গির্জা ঘণ্টাখানেকের পথ। দু টাকা ভাড়া। নূতন লোক পেয়ে হয়ত কিছু বেশী আদায় করল। তাতেও পরিতৃপ্তি। ধীর গতিতে দুচোখ দিয়ে শহরটা দেখে যাবে। উপভোগ করবে পূর্ণ স্বাধীনতা।

জুলাইয়ের আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। ভোরের সোনালী রোদ্দুর। রাস্তায় নাগরিক মানুষের অবাধ চলাফেরা। সিনেমার পোস্টার, দোকানের অঙ্গসজ্জা। অপরিমেয় উপকরণের আয়োজনে পরিব্যাপ্ত জীবনানুভূতির নৈবেদ্য।

বৃটিশ মিলিটারি হসপিটাল, এলাহাবাদ।

গাড়ি পৌছায় মেন অফিসের সামনে।

প্রশস্ত সিঁড়ি। এক বুক উঁচু বারান্দা।

বাবুরা তখনও কেউ অফিসে আসেন নি। সাহেবরা আসবেন বাবুদেরও পর।

রাস্তার অপরদিকে প্রকাণ্ড নিমগাছ। মালপত্র তার গোড়ায় নামিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় দেয় প্রদ্যুম্ন।

অপেক্ষা করে।

বাবুরা আসেন। সাহেবরা এসে আফিস-ঘর আলোকিত করে বসেন। কেউ তার দিকে তাকান না।

সাহস করে ভিতরে যায়। দু বুটের সংঘর্ষে খট শব্দ তুলে মিলিটারি কেতায় সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

সাব-চার্জ ক্যাপ্টেন র‍্যাচেল সাহেব ইংরেজের দেশজ সংস্করণ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকান।

মুভমেণ্ট অর্ডারটা সে সামনে ধরে।

—হুঁ। বাইরে অপেক্ষা কর।

সমস্ত রাত্রি ট্রেন-ভ্রমণের ক্লান্তিতে কাতর সে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। চাপরাসীদের বেঞ্চির এককোণ আশ্রয় করে।

বারান্দায় বুট-পরা পায়ে খটখট আওয়াজ তুলে লোক আসছে যাচ্ছে। একজন গোরা সার্জেণ্ট অবজ্ঞার কটাক্ষে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সে অপেক্ষা করছেই।

আকাশ-ঘড়িতে সূর্যের রঙ বদলাচ্ছে। স্নিগ্ধ স্তব্ধ নীলিমা পাণ্ডুর হয়ে উঠছে জ্বলন্ত রোদ্দুরে।

চাপরাসীটা দক্ষিণ-দেশী। সংকোচ কাটিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে এতক্ষণে আলাপ করতে এলো। অফিসে পোস্টিং পেয়েছে শুনে সসম্মানে ছেড়ে দাঁড়াল বেঞ্চিটা।

আরও কয়েক মিনিট বাদে হেডক্লার্ক রঘুনাথ প্রসাদ বাইরে এলেন। বৃদ্ধ মানুষ। মাথায় একটা চুলও কালো নেই।

—তুমি ভাই, এখানে পোস্টিং পেয়ে এসেছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাইরে কেন। অফিসের ভেতরে এসে বসতে হয়।

—কেউ বলে নি তো।

ভদ্রলোক হাসলেন। চাপরাসীকে বললেন স্টোর থেকে ঘোষবাবুকে ডেকে আনতে।

কয়েক মিনিট বাদে তিনি এলেন। প্রদ্যুম্নর বয়সীই একটি ছেলে। উপক্রমণিকা শুনে এসেছে বোধহয় রঘুনাথ প্রসাদের কাছে।

কোনো ভূমিকা না করেই শুধালে—আপনার নাম কি ?

নাম বললে প্রদ্যুম্ন।

—আমার নাম পরিমল ঘোষ। যাক, আমাদের একজন সাথী বাড়লো।

বিনয় প্রকাশ করতে হাসলো প্রদ্যুম্ন।

—আসুন।

পরিমলের পেছনে রওয়ানা হল প্রদ্যুম্ন। কিট বয়ে আনছে অফিসের সেই চাপরাসী।

এখানে ব্যারাক নেই। কোয়ার্টার্স। দু-রুমের এক-একটি ইউনিট ; পায়খানা বারোয়ারী। স্ত্রী-পুরুষে ভাগ করা। যুদ্ধপূর্বকালীন ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। লড়াইয়ের স্ফীত-কলেবর ফৌজের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। একটা কোয়ার্টার একজনকে দেবার বদলে একখানা সংকীর্ণ রুম দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারই একটিতে নিয়ে এল পরিমল।

চারপাইয়ের উপর পা ছড়িয়ে বসলো।

—দোরগোড়ায় এতক্ষণ কেন আপনাকে বসিয়ে রাখলো র‍্যাচেল তার কারণটা জানেন ?—আপনি এখানে একান্ত অবাঞ্ছিত।

—অপরাধ ?

—গৃহসুখে বাগড়া দিলেন।—

অর্থটা স্পষ্ট নয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্ন তাকায়।

পরিমল হাসে। কৌতুক-মিশ্রিত আনন্দের হাসি। বলে—এইবার ঠিক প্যাঁচে পড়েছে শালা র‍্যাচেল। ঠেকাক এইবার—

—কিছুই কিন্তু বুঝলাম না।—

—সে অনেক কেচ্ছা-কেত্তন, মশাই। চট করে বুঝবেন না। অত সময়ও আমার হাতে নেই। পোশাক ছেড়ে চান করে আসুন। বাবাজীকে বলে যাচ্ছি, চা দিয়ে যাবেখন। চা খেয়ে সটান শুয়ে পড়ুন।

—অফিস ?

—আজ রেস্ট। এই কনভেনশান।

যাবার জন্য ওঠে পরিমল।

—কাগজ রাখেন না ?

—কাগজ রাখা এখানে বে-আইনী।

পৃথিবীর দ্বার এখানেও বন্ধ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রদ্যুম্ন।

বাবাজী এখানকার বেসামরিক চৌকিদার। সাতাশ বছর চাকুরী। তাকে ছাড়ানো যায় নি। গেটে এখন মিলিটারি পাহারা বসেছে। বাবাজী রাত নটা

থেকে সকাল পাঁচটা অবধি লাঠি নিয়ে ফ্যামিলি-ওয়ার্ডের বারান্দায় রাত জাগে। স্বল্প মাহিনা। সঙ্গে কলেজে পড়ুয়া ছেলে বাস করে। তার আহার ও শিক্ষার বাবুদের রান্নার উপরি কাজ করে সংস্থান করে।

চা দিয়ে গেল।

বয়স্ক লোক। কথা বলতে ভালোবাসে।

চায়ের পাত্রগুলো তুলে নিতে এসে বললে—ভালো করে ঘুমিয়ে নিন বাবু। হয়ত সন্ধ্যার গাড়িতেই ফেরত যেতে হবে।

সে থাকবে কি যাবে, নিশ্চয় এর কাছে কেউ পরামর্শ করতে আসে নি। যদি-বা কেরানীবাবুদের আলোচনা থেকে কিছু জেনেও থাকে, সেটাকে জাহির করে বাহাদুরী নেবার অকারণ সদিচ্ছা কেবলমাত্র প্রদ্যুম্নর বিরক্তি উৎপাদন করে। কণ্ঠেও তা প্রকাশ পায়।

—তোমাকে কে বলেছে?

রহস্যপূর্ণ হাসিতে ওষ্ঠদ্বয় রক্তিম করে বাবাজী।

—র‍্যাচেল সাহেব যতদিন আছেন, পাঁড়েবাবুকে হঠায় কে? দুবার বদলীর হুকুম হল, দুবারই সে হুকুম রদ হল।

কথাটা আর বাড়ায় না প্রদ্যুম্ন।

কোথায় যেন এর কোনো বিশেষ তথ্য আছে। পরিমলও সেই আভাস দিয়ে গেল।

প্রদ্যুম্ন সিগারেট ধরায়।

দুশ্চিন্তা সত্যি হয়। তবুও ভবিতব্যতার হাতেই নিজেকে সে সঁপে। ফৌজী জীবনে সাধারণ সৌজন্য এবং শুভেচ্ছা ছাড়া আর কোনো ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

এরাও হয়ত ঠেলে দেবে তাকে। দূরে কিংবা নিকটে। কিংবা মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে স্বীকার করেই তো ফৌজে এসেছে।

দুপুরবেলা পরিমল ও পালিত একসঙ্গে খেতে আসে। পালিত এই রুমের অপর অংশীদার। প্রায় পরিমলের বয়সী। সেও স্টোর-ক্লার্ক।

খুব খুশী পরিমল।

—শালা র‍্যাচেল খুব জব্দ। বড়সাহেবকে বলেছিল লক্ষ্ণৌয়ে ফোন করতে—বড়সাহেব রেগে গেছেন।

প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারে পাণ্ডেকে যেতে হল। এবং সে সম্ভবত রয়ে গেল।

কিন্তু পাণ্ডেকে নিয়ে সকলের কেন যে এত মাথাব্যথা, অসীম কৌতূহল সত্ত্বেও সে-প্রশ্ন করতে পারল না। সকালে প্রশ্ন করেছিল পরিমলকে। সে এড়িয়ে গেছে। সমম্নাভাবের ব্যাপারটা অজুহাত হয়ত।

আহারের এক ঘণ্টা ছুটি। ওরা আবার কাজে যায়।

কোয়ার্টারের সম্মুখে একখণ্ড প্রকাণ্ড জমি। বৃষ্টির প্রথম ছোঁয়া পেয়েই সবুজ ঘাস মাথা তুলেছে। নিম আর শিশু গাছের সার। তারপর সাধারণ রাস্তা। আরা গির্জার পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। পথে লোক চলাচল বেশী নেই। দু-একখানা টাঙ্গা কি এক্কা একঘেয়ে নিস্তব্ধতাকে চকিত করে মাঝে মাঝে। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র পীচের রাস্তায় ঠিকরে পড়ে।

অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন। গতি নেই। বৈচিত্র্যও নেই। একঘেয়ে নিশ্চলতার ক্লান্তি। শোওয়া-বসা করে সময় কাটে না।

তিনটে নাগাত একজন নতুন লোক ঘরে আসেন। হাবিলদার। স্বাগত করবার প্রয়োজন হয় না। বিনা দ্বিধায় পাশের চারপাইটাতে বসেন।

—আমার স্ত্রী হেড-কোয়ার্টারে আপীল করেছিলেন। বোধহয় শুনেছেন।

—না।

—জবাবটা আসতে দেরী হচ্ছে।

—কি করে বলব।

—আমি খুবই বিপদে পড়েছি। স্ত্রীকে রেখে যাবার কোনো জায়গা নেই।

—কেন, আপনার ঘর-বাড়ি কিছু কি নেই?

—দেশে আমার বড়ভাইরা আছেন। আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করেন—সেখানে সে থাকতে পারে না।

প্রদ্যুম্ন চুপ করে থাকে।

—আপনি কিছু বলবেন কি?

—কি বলবো। আমি তো স্বেচ্ছায় আসি নি।

—সে তো একশবার নিশ্চয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই এই বিপদ থেকে আপনি আমায় বাঁচাতে পারেন।

—বলুন।

—আপনি এসেছেন, কালকে ডিউটিতে জয়েন করবেন। কিন্তু তা না করে আপনি যদি ইণ্ডিয়ান হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে নেন।

—আমার তো সত্যি কোনো অসুখ নেই।

—তাতে কিছু আটকাবে না। দশ-বারো দিন খাবেন-দাবেন—তারপর মাসখানেক পুরো মাইনেতে সিক-লিভ পাবার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

একান্ত আকস্মিকভাবে সিস্টার বোসের কথা মনে পড়ে যায়। তিনিও ছুটি দিতে চেয়েছিলেন। উৎকট স্বার্থে। অথচ মানুষের মর্যাদাও তাকে দেন নি।

এ যেন প্রচণ্ড খামখেয়াল। সহস্র কানুনের শৃঙ্খলে বাঁধা সাধারণ মানুষ। তারা সৈনিক, তারা ফলোয়ার। তাদের উপরতলায় চক্রান্ত। 'না'কে 'হ্যাঁ' করানো কথার কথা মাত্র।

তাকে নীরব দেখে আবার আশ্বাস দেন।

—আপনি ভাববেন না। ছুটি আপনার হবেই। র‍্যাচেল সাহেবের বিস্তর প্রতিপত্তি। ইণ্ডিয়ান হাসপাতালে তিনি ফোন করলে, এ আর এমন কি চারটিখানি কথা।

তাহলে ইনিই সেই পাণ্ডে। এতক্ষণে প্রদ্যুম্নর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। প্রশ্ন করে—তিনিই বা কেন ফোন করবেন ?

—আপনি নিশ্চিত থাকুন, তিনি করবেন।

সে আভাস প্রদ্যুম্ন ইতিপূর্বেই পেয়েছে।

কিন্তু কেন, এই প্রশ্নের জবাব রহস্যের মধ্যেই থেকে গেল। অথচ সেই ঘটনাটাই পরিষ্কার করতে চাইল না বাবাজী, পরিমল কিংবা স্বয়ং পাঁড়েজী।

হঠাৎ আরেকটা নূতন আশ্বাস দেন পাঁড়েজী।

—হাসপাতালেও আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। স্বয়ং র‍্যাচেল সাহেবের রোগী—আদর-যত্নেই থাকবেন।

আবার হাসপাতাল। সেই রূঢ় স্মৃতি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে প্রদ্যুম্ন। মন কিছুতেই সমর্থন জানায় না।

—তাহলে র‍্যাচেল সাহেবকে বলবো ?

এক বিরুদ্ধ চেতনা প্রদ্যুম্নর মনে ছায়া বিস্তার করে। জবাব দেয়—না।

হয়ত অনেক আশা করে এসেছিলেন পাঁড়েজী। মুখখানা অন্ধকার হয়ে ওঠে। মিনিট দুই চুপ করে বসে থাকেন।

—একটা মেয়ে অসহায় হয়ে ভেসে বেড়াবে। আপনি শিক্ষিত। আপনার কাছে সে কি কোনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারে না ?

—আমাকে যদি যেতে বলে, অত্যন্ত খুশী মনে চলে যাব। কিন্তু কোনো অন্যায় চাতুরীর মধ্যে আমি যেতে পারব না।

—আপনার নিজের তো কোনো লোকসান নেই, বোসবাবু।

—আমার স্বার্থের কথা আপনার ভাববার দরকার নেই।

খপ করে হাতটা ধরে ফেলেন পাঁড়েজী।

—আমার স্ত্রী একদম পথে দাঁড়াবে, বোসবাবু। ক'দিন ধরে দিনরাত্তির সে কাঁদছে।

একটা মেয়ে কাঁদছে। পৌরুষে অনন্তকালের দুর্বলতা দংশন করে। তবু একটা প্রশ্ন সে চেপে রাখতে পারে না।

—সমস্ত জেনেও এ পথে কেন এলেন আপনি?

—তক্‌দির।—কপালে হাত ঠেকান পাঁড়েজী।

যুক্তি-নিরপেক্ষ উত্তর।

প্রশ্নটা আবার ফিরে আসে। নিঃসংশয়ে মীমাংসা হয় না। ক্ষতি কি। একটি নারীর জীবন থেকে উৎকণ্ঠার মেঘ যদি সে অপসৃত করতে পারে, মানুষ হিসাবে তাই কি পরম বাঞ্ছনীয় নয়?

তেমনি আরেকটা প্রশ্নও বিপরীত দিক থেকে মনকে ধাক্কা দেয়। মাসের পর মাস একসঙ্গে বাস করেও কেন বাবাজী, পরিমল, এদের সহানুভূতি লাভে সক্ষম হলেন না পাঁড়েজী। তাদের চোখে মুখে খুশী। কৌতুক। কিসের সে কৌতুক?

—চলুন আমার কোয়ার্টারে। চা খাবেন।

বিব্রত বোধ করে প্রদ্যুম্ন। মুখে বলে—বেচারার মন ভালো নেই। তাকে বিব্রত করা ঠিক হবে না। তার চেয়ে চলুন ক্যান্টিনে।

—আমার জন্য তো চা হচ্ছেই।

বারান্দায় ভারি বুটের শব্দ। পাঁড়েজী উচ্চকিত হন।

ঘরের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে দ্বারে দাঁড়ায় পরিমল। ঠোঁটের কোণায় তীক্ষ্ণ কৌতুকের হাসি।

—পাঁড়েজীর ঘরে চা খেতে চললেন নাকি বোস?—কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।—আপনি ভাগ্যবান, বোস। তিনমাস একসঙ্গে থেকেও পাঁড়েজীর ঘরে এক কাপ চা খাবার পুণ্য আমাদের কারো হয় নি।

পাঁড়েজী উসখুস করেন।

পরিমল ভিতরে আসে না। বাইরে থেকেই ডাকে—

—শুনুন, বোস।

বারান্দা পার হয়ে মহুয়া গাছের নীচে এসে দুজনে দাঁড়ায়।

—কী বলছে পাঁড়েজী?

প্রত্যুম্ন সংক্ষেপে সমস্ত বলে।

—কথা দিয়েছেন?

—না।

—কক্ষনো দেবেনও না। শালা একটা ডিবচ। ঘরে নিয়ে বোকে দিয়ে ফুসলাবার মতলব।

—মানুষের বিপদ, উৎকণ্ঠা—এগুলোকে কেন বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছেন ঘোষবাবু?

—থামুন না। আপনার চেয়ে আমি ঢের জানি।—ধমক দিয়ে ওঠে পরিমল।

পাঁড়েজী তখনও বসেছিলেন। কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে অপ্রীতিকর কাজটা পরিমলই করে।

—আমরা বাইরে যাচ্ছি, পাঁড়েজী। দোরে তালা দিয়ে দেব।

পাঁড়েজীর চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে যান।

টাঙ্গায় বসে কাহিনীটা শুরু করে পরিমল।

নীল আকাশ। তারাগুলো মিটমিট করছে। দূরে একখণ্ড কালো মেঘ। চাঁদটাকে ঢেকে উড়ে যাচ্ছে। ক্যাণ্টনমেণ্টের দূর ব্যবধান লাইট-পোস্টে আলো-আঁধারি।

—একটা পাকা ডিবচ। ঘরে বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, পয়সাকড়ি পাঠায় না। বৌটা দু-দুবার আপীল করেছে কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে। আর হারামী বেটাচ্ছেলে কোথা থেকে একটা মেয়ে জুটিয়ে এনে বলছে বৌ। বৌ-টৌ কিচ্ছু নয়।

—কেন, দুটো বিয়ে করা কি এদেশে নতুন কথা?

—বিয়ে-করা বৌ হলে র‍্যাচেলের সঙ্গে সিনেমায় পাঠাত না।

—যান, বাজে কথা।

—হাসপাতালে সবাই জানে।

—দেখেছে কি কেউ?

—তালে থাকলে আপনিও দেখতে পাবেন।

যুদ্ধ চলছে।

বার্মা-সীমান্তে, আফ্রিকায় এবং সোভিয়েট দেশে।

ফৌজী আখবারে সৈনিকদের বীরত্ব ও বশ্যতার অতিরঞ্জিত প্রশংসা। যুদ্ধের খবর নেই। বাইরের কাগজ আসা বন্ধ।

তবু ছিটে-ফোঁটা খবর আসছে। চন্দ্রনারায়ণ এবং মাংস-ডিম-শাকসব্জির ঠিকেদারদের মুখে মুখে। অনুমতি নিয়ে শহরে বেড়াতে গেলে চায়ের দোকানে বসে কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে আসা যায়।

ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন খবরগুলোতে কৌতূহলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

দেশের উপর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাহ বইছে।

ক্রিপস্ সাহেবের ব্যর্থতার পর নতুন প্রস্তাব আসবে প্রত্যাশা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু কোনো প্রস্তাব আসে নি।

'মানবতার জন্য যুদ্ধে' ভারতের ভাগ্যলিখনে বুভুক্ষু মানবগোষ্ঠী কামানের গোলায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু দেশের জনমত তা স্বীকার করে নিতে পারে নি।

জনমতের প্রতিধ্বনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কণ্ঠে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত দেশকে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। আশু স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছে মানুষের দেশাত্মবোধ।

খবর যেমন করেই হোক আসছে। প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং নতুন চিন্তাস্রোতের জন্মলাভ ঘটছে এলাহাবাদের বৃটিশ মিলিটারি হসপিটালের একটা সংকীর্ণ ঘরের তিনটি মানুষের মনেও।

প্রত্যুম্নরও আত্মনিগ্রহ শুরু হয়েছে। অত্যন্ত হেয় মনে হচ্ছে নিজেকে। দেশের কাছে, সমাজের কাছে অপরাধী হয়েই তারা রয়ে গেল। উর্দি-পরা সজ্জায় শহরের রেস্তোরাঁয় বসতে এখন লজ্জা করে। হীনমন্যতায় মাথা নুইয়ে আসে।

যুদ্ধ হচ্ছে লেডো কিংবা আরাকানে। টহলদারী ফৌজে। তার ছিটে-ফোঁটা খবরও এখানে আসে না। কিন্তু আসছে আসামের জলবায়ুর শিকার। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কালাজ্বরে দীর্ঘ চিকিৎসা যাদের প্রয়োজন। চোখে

তাদেরও দেখা যায় না। অফিসে বসে প্রত্যুম্ন পায় কেসশীট কিংবা ট্রান্সফার পেপার। আর প্রতি সপ্তাহে যোগ-বিয়োগের হিসেব পাঠায় বিভিন্ন সদর দপ্তরে।

আরেকটা চমকপ্রদ যুদ্ধ চলছে এই হাসপাতালে। মানসিক যুদ্ধ। দাবার চালবাজী।

পাঁড়েজী ইণ্ডিয়ান হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যাহ্নে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান কোয়ার্টারে। পাঁচটায় প্রসাধনের গাঢ় প্রলেপ মেখে রোজ বেড়াতে যান পাঁড়ে-গৃহিণী। তিনি ফৌজের বেতনভুক নন। ফৌজী কানুন তাঁর উপর প্রযোজ্য নয়। ফেরেন রাত্রি নটা-দশটায়।

রোজ অফিসে র‍্যাচেল সাহেবের কাছে ধমক খাচ্ছে প্রত্যুম্ন। কমা-সেমিকোলন, এমনকি লেখার লাইনটা একটু বাঁকা-ট্যারা হওয়ার যে-কোনো ছুতায়।

সেই জুজুর তাণ্ডব। দেওয়ান সিং নয়, র‍্যাচেল সাহেব। সেই গালিগালাজ হৈ-রৈ নেই। আছে অসীম ঘৃণায় মুখ-বিকৃতি। অর্ধস্ফুট তীক্ষ্ণ অমার্জিত বাক্য।

হপ্তা-দিনও অতিক্রম হয় না। একটু যেন বিচলিত হলেন রঘুনাথ প্রসাদ। বৃদ্ধ মানুষ। স্বল্পভাষী। দ্বন্দ্বের চাহিদায় অবসর বন্ধ। নিজের সীটে বসে নিরিবিলি কাজ করেন। হাসপাতালের কোয়ার্টারে পরিবার নিয়ে বাস। প্রত্যুম্নকে চা-পানে আহ্বান করেন এক সন্ধ্যায়।

কেচ্ছা-কেত্তনের ধার দিয়েও যান না।

উপদেশের কণ্ঠে বললেন—হাল, সব বুঝতে পারছ বোসবাবু। দু-দশদিন হাসপাতালে আরাম করে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়াই কি ভালো নয়?

অন্ততঃ এই মানুষটির কাছ থেকে এরূপ প্রস্তাব প্রত্যাশা করে নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রত্যুম্ন।

—তুমি ছেলেমানুষ, বাবু। ওরা ধূর্ত। ওদের হাতে অনেক ক্ষমতা। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে।

—এটা একটা কুৎসিৎ ষড়যন্ত্র না হলে এই সুযোগ ছাড়তাম না। কিন্তু অন্যায়কে আপনিও প্রশ্রয় দিতে বলছেন বড়বাবু?

—নিরুপায়কে অনেক সইতে হয়, বোসবাবু।

—কিন্তু আমারও তো বিবেক বলে একটা পদার্থ আছে। ক্ষতি করে করুক।

রঘুনাথ প্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—

আমরা বুড়ো হয়েছি, পাঁচটা দিক ভাবি। অকারণ তোমার ক্ষতি হবে, দুঃখ সেখানেই। জেদ করে লাভ তো কিছুই হচ্ছে না।

—না হোক। আপনি আমাকে এই অনুরোধ করবেন না।

নিরিবিলি মানুষ। প্রদ্যুম্নর কণ্ঠে জেদ অনুভব করে চুপ করে গেলেন।

মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধান। রঘুনাথ প্রসাদ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, অচিরেই তা বাস্তবে পরিণত হল।

রোগী-পরিসংখ্যানের দায়িত্ব প্রদ্যুম্নর। ৩-বি ওয়ার্ডের ডায়েট রিকুইজিশান এবং পরিসংখ্যানে দুজন রোগীর তফাত। অফিসে তুফান তুললেন র‍্যাচেল।

অফিসের খাতার সঙ্গে ওয়ার্ডের খাতা মিলিয়ে দেখবার প্রস্তাব করেন রঘুনাথ প্রসাদ। ওয়ার্ডের সংখ্যায় কোনো ভুল নেই বলে তাঁকে হাঁকিয়ে দেন র‍্যাচেল।

ভারতীয় ফৌজী আইনের বিশেষ ধারায় বৈধ কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে অভিযুক্ত হল প্রদ্যুম্ন। কমাণ্ডিং অফিসার স্কচ—কর্নেল জেকিন্স কি বললেন, অর্ধেক কথাই বোধগম্য হল না। ক্যাপ্টেন র‍্যাচেল বিপক্ষে অনেক বলে রেখেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে বলবার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হল না। প্রদ্যুম্নর চোদ্দ দিনের ট্রেড-পে বাজেয়াপ্তের হুকুম দিলেন।

জেকিন্সের খাস কামরা থেকে নিজের টেবিলে ফিরে এলো প্রদ্যুম্ন। রঘুনাথ প্রসাদ গম্ভীর মুখে বসে আছেন। চোখ দুটি টেবিলের উপর। মাথা গুঁজে অন্যরা কাজ করছে। অফিস নিস্তব্ধ।

অন্যদিন কাঁটায় কাঁটায় একটা না বাজলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য রঘুনাথ প্রসাদ ওঠেন না। সেদিন আধ ঘণ্টা আগেই অফিস ত্যাগ করে চলে যান। একটায় অন্যরাও ওঠে। ওঠে না শুধু প্রদ্যুম্ন—সিগারেট ধরায়। এই অকারণ নিগ্রহের বিরুদ্ধে মন অধিকতর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

মিনিট পনরো বাদে আসে পরিমল। মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

—চোদ্দ দিনের ট্রেড-পে গেছে বলেই মুখ ভার করে বসে আছিস? টাকা কটা নিয়ে নিস আমার কাছে থেকে।

—আমার বোধহয় হার হল।

—হারজিৎ এখনই কি? সবে তো শুরু। চল, খেতে চল।

বিকেলবেলা রঘুনাথ প্রসাদ অফিসে এলেন না। সবাই জানে জরুরী

প্রয়োজনে কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে শহরে দেখা করতে গেছেন। এক ফাঁকে অফিসে এলো পরিমল। প্রদ্যুম্নর টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

—বড়বাবু ফেরেন নি ?

—শহরে গেছেন।

কানের কাছে মুখ নিয়ে এল পরিমল।

—বোকা। গেছেন ইণ্ডিয়ান হাসপাতালে। দেখিস কাল পাঁড়েজী ফিরে এল বলে।

সত্যি পরদিন ফিরে এল পাঁড়েজী।

এক মাসের সিক-লিভ।

রেলওয়ে ওয়ারেণ্ট নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল আজমগড় জেলার কোন এক অখ্যাত স্টেশনে। ছুটির শেষে রিপোর্ট করবে আট নম্বর ব্যাটালিয়ানে। খোদ কর্নেল সাহেব ছুটির কাগজ সই করেছেন। সইয়ের জন্য র‍্যাচেল সাহেবের ধারে-কাছেও যান নি রঘুনাথ প্রসাদ।

৩-বি ওয়ার্ডের ডায়েট রিকুইজিশান এবং পরিসংখ্যানগত বৈষম্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল দিন তিনেক বাদে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই দুজনের কন্‌ভালেসেণ্ট ডায়েট বেশী নেওয়া হচ্ছিল ওয়ার্ড থেকে। জনৈক ব্রিটিশ-আদার-র‍্যাঙ্ক হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েও এলাহাবাদের মায়া কাটিয়ে তার ইউনিটে ফিরে যেতে পারে নি। ডায়েট দুটো যাচ্ছিল তারই ভোগে। অপরাধ বিলেতী সিস্টারের। কিন্তু কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বেরুল না।

শাস্তিদানের সংবাদ তার আগেই পাঠানো হয়েছে আট নম্বর ব্যাটালিয়ানে।

কমাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করেও কোনো ফল হল না।

কেননা সামারি পানিশমেণ্টের বিরুদ্ধে আপীল নেই !

সমস্ত দেশটা এইবার বুঝি ফেটে পড়বে !

আসমুদ্রহিমাচল এক প্রলয়ের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। নতুন জীবনের আশ্বাস। পরাধীনতার কলঙ্ক থেকে মুক্তিস্নানে চলেছে এক জাতি।

ক্লাবে, আড্ডায়, রেস্তোরাঁয় তিনজন মানুষ দেখা হলেই নাকি ঐ এক প্রসঙ্গ। সমস্ত এলাহাবাদ শহরটা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে নির্দেশের অপেক্ষায়।

নির্দেশ আসন্ন। ৭ই আগস্ট জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীর নেতৃত্বে মিলিত হচ্ছেন বোম্বাই নগরীতে। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সেখানেই।

বোম্বাই যাত্রার পূর্বে এলাহাবাদ শহরে মহতী জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে জাতিকে আহ্বান জানালেন জহরলাল। এলাহাবাদের সমস্ত লোক ভেঙে পড়েছে তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

বহির্বিশ্বের সংবাদ-সংগ্রহের একমাত্র সেতু চন্দ্রনারায়ণ।

বাবাজীর ছেলে চন্দ্রনারায়ণ। কলেজে পড়া ভুলেছে। তার মুখে কংগ্রেস, গান্ধীজী, নেহেরুজী আর মানুষে-মানুষে এক হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতের সেই চিরপ্রত্যাশিত দিনটির কথা।

প্রদ্যুম্ন সুযোগ পেলেই তাকে ডাকে। পালিত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। পরিমলের মুখখানা থমথম করে। পাশের ঘরের বুড়ো পে-ক্লার্ক শর্মাজী এ-ঘরে এসে বসেন।

পরিমল চোখ টেপে। প্রদ্যুম্ন গম্ভীর হয়। পালিত একটা পুরানো আর্মি-ডাইজেস্ট নিয়ে শুয়ে পড়ে।

চন্দ্রনারায়ণের উচ্ছ্বাস চট করে বন্ধ হয় না।

শর্মাও যেন আবেগে ফুলে ওঠেন।

—একটা ওলট-পালট হয়ে যাক ঘোষবাবু। শালা আংরেজের জুতার ঠক্কর আর সহ্য হয় না।

পরিমল যেন কিছুই জানে না।

বলে—চন্দ্রনারায়ণটা আদার বেপারী। বড় বড় জাহাজের খবর নিয়ে আসছে। ছেলেমানুষীতে আপনিও কান দেন শর্মাজী?

—না, না, ঠিক বলেছে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভার ফতেচাঁদ 'হিতবাদা' কাগজ নিয়ে এসেছে। বলবেন না কারোকে। আপনি তো হিন্দী পড়তে পারেন।

ও-ঘর থেকে মাদ্রাজী ক্লার্ক নাথুয়েলও ইত্যবসরে এ ঘরে আসে। প্রসঙ্গটি চাপা দিতে চায় পরিমল।

—ও সমস্ত বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নে। ইংরেজ বলছে 'শালা গোলাম',—কংগ্রেসওয়ালা বলবে 'শালা ভাড়াটে গুণ্ডা। তার চেয়ে কোনো মজাদার গল্প বলুন, মনটা চোস্ত হবে।

—ঠাট্টার কথা নয় ঘোষবাবু। সত্যি সত্যি আমরা উভয়সংকটে পড়েছি।

চন্দ্রনারায়ণ সরে গেছে। পালিতের ইঙ্গিতে।

পরিমল ঠাট্টার সুরে বলে—আমার কিন্তু একটাই সংকট শর্মাজী। একটা টেম্পোরারি ওয়াইফ। পাণ্ডেকে কত বললাম। কিন্তু শালা কিছুতেই পথ দেখালো না।

শর্মাজী বুঝতে পারেন তাঁর কথা নিয়ে পরিহাস চলছে। মুখ ভোঁতা করে উঠে যান।

মিনিটখানেক বাদে নাথুয়েলও নিজের ঘরে চলে যায়।

পরিমল বলে—খুব সাবধান। র‍্যাচেলের হাতের জিনিস ফস্কে গেছে। এবার ঠিকমতো বাগে পেলে শূলে দেবে। নাথুয়েলটার রকমসকম কিন্তু ভালো নয়।

পালিত বলে—পাণ্ডের কোয়ার্টার নাকি ফ্যামিলি-ওয়ার্ডের আয়াকে দিচ্ছে।

—তুই দাবি ছাড়িস নে। কর্নেল সাহেবের কাছে পেশি হয়ে যা। এ ঘরে তিনজনের অ্যাকোমোডেশান হয় না।

সাতাশ বছর যে মানুষটি সামরিক হাসপাতালে সতর্ক রাত জেগেছে তার চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। আহারের সময় বাবাজী প্রশ্ন করেন—বাবুজী, কি বলছে চন্দর? স্বোরাজ নাকি বারো আনা রাস্তা এসেই গেছে।

—আন্দোলন শুরু হয়েছে। অসম্ভব মোটেই নয়।

—স্বোরাজ এলে ভালো। কিন্তু কাংগ্রেস কি আংরেজের সঙ্গে পেরে উঠবে?

—পারবে না কেন?

একমুহূর্ত কি যেন ভাবেন বাবাজী।

—কিন্তু ফৌজ হল আংরেজের খাস রাজত্ব। এখানে কাংগ্রেসের নাম নিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

এই সম্ভাবনার এমন কি কারণ দেখতে পেল বাবাজী। তবু তর্ক না তুলে চুপ করে যায় প্রদ্যুম্ন।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াটুকু নিজের ঘরে এসে মিনিট দুই বাদেই শুনতে পায়। রসুইঘরে চাপা কণ্ঠে চন্দ্রনারায়ণের উপর শাসন চলছে। গোরখপুরী সাধুভাষা। বাবাজীর উত্তেজনা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। তারপর দুমদাম আওয়াজ। গুমরে কাঁদছে চন্দ্রনারায়ণ।

প্রদ্যুম্নর ভেতরেও একটি নিভৃত সত্তা কাঁদে। একি পরাধীনতার পাপ? না রুটির জন্য আত্মবিক্রয়ের গ্লানি? অন্নের বিনিময়ে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। এক বাস্তব সংঘাত। যেখানে পরম সত্যও লজ্জায় হার মানে।

বুভুক্ষু অন্তর তবু তো কাঁদে।

ঐ তো চন্দ্রনারায়ণ কাঁদছে। এই অশ্রুজলে অন্তরের বিশ্বাস ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যায় না।

হয়ত যাবেও না।

কিন্তু চন্দ্রনারায়ণ আর আসে না। এড়িয়ে চলে।

আরেক সন্ধ্যাবেলায় বিপদসূচক ঘণ্টায় সমস্ত হাসপাতাল চঞ্চল হয়ে ওঠে। গার্ড-রুমের দিকে ছোটে সবাই। যে অবস্থায় যে আছে। মুখোমুখি দুদলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দেশী আর গোরা পল্টন। সামরিক ডাক্তাররা এসে গোরাদের পাশে আলাদা লাইন দিয়ে দাঁড়ান।

—বৃটিশ সেকশান রাইট ড্রেস—

—অ্যাটেনশান—

—রাইট টার্ন—বাই দা লেফট্ কুইক মার্চ—

বেশ কিছুটা দূরে বৃটিশ সেকশানকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন মেজর লেভিট।

সাবচার্জ এবং কমাণ্ডিং অফিসারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন হেডক্লার্ক রঘুনাথ প্রসাদ। সামনে আসেন।

হুকুম দেন।

—সেকশান অ্যাটেনশান।

সামরিক কেতায় অভিবাদন করেন। প্রত্যভিবাদন করেন কর্নেল জেকিন্স।

এগিয়ে আসেন র‍্যাচেল সাহেব।

—স্ট্যাণ্ড অ্যাট ঈজ।

র‍্যাচেল সাহেব হিন্দিতে বলেন—

....মহামান্য সম্রাট ও ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কয়েকজন ভ্রান্ত নেতা অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশ-রক্ষার ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে অপচেষ্টা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য জাপানীদের এদেশে ডেকে আনা এবং হিন্দুস্থানের সর্বনাশ-সাধন। সেই সমস্ত নেতা কারারুদ্ধ হয়েছে। এখনও তাদের কিছু কিছু অনুচর দু-এক জায়গায় গোলযোগ করবার চেষ্টা করছে।

....ইংরেজরা দুশো বছর ধরে এদেশের মানুষের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করেছে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কলকারখানা খুলেছে। সেখানে দেশের হাজার হাজার মানুষ কাজ পাচ্ছে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের সমকক্ষ হয়ে উঠছে।

....জাপানীরা এশিয়ার এক অর্ধসভ্য জাতি। তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। তারা এসে লুণ্ঠন করবে। গৃহস্থের জীবন বিপন্ন করবে। মেয়েদের সতীত্ব হরণ করবে। এমন একটা পাশবিক জাতিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবার চক্রান্তকে ব্যর্থ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

....তোমরা বোধহয় জান না এই দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ ইংরেজ সৈন্য আছে যে-কোনো হামেলাকেই তারা মোকাবিলা করতে সক্ষম। এমনকি ভারতীয় সৈন্যদলে যদি কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দেয়, তাকেও কঠোর হস্তে দমন করা হবে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ফিল্ড-পানিশমেণ্ট। ফাঁসি কিংবা গুলী করে হত্যা। কোনোরূপ করুণা তারা পাবে না।

....কংগ্রেসী লোকেরা দু-এক জায়গায় ভারতীয় ফৌজী লোককেও আক্রমণ করে বেদম প্রহার করেছে। সেজন্য হুকুম, লাইনের বাইরে কোনো জোওয়ান যাবে না। যে-কোনো প্রয়োজনেই হোক। যদি কেউ যাবার চেষ্টা করে তাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কতকগুলো নির্জীব ছায়া লাইনে ফিরে গেল। সংশয়ান্বিত মানুষ। অধিকাংশ ভীত।

কোয়ার্টারে এসে পালিত মুখ খুললে।

—শালা যেন গস্‌পেল পড়ে শোনাল এতক্ষণ।

—শালাদের ভয় লেগেছে।—পরিমল বললে—দেখলিনে গোরাদের আলাদা করে কি-সব মতলব শেখাতে গেল।

—কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না বাইরের। শালারা একদম কয়েদী বানিয়ে রেখেছে।

—চন্দরকে ডেকে শহরের খবরটা একবার শুনলে হয়।

এতক্ষণে কথা বলে প্রত্যুয়।

—ওর বাবা যখন ওকে জুতো-পেটা করবে, কে ঠেকাবে?

—রাত আটটায় বেটাচ্ছেলে চলে যাক ফ্যামিলি-ওয়ার্ডে, তখন ডাকবো।—পালিত বললে।

কিন্তু চন্দ্রনারায়ণকে ডাকতে হয় না।

কেটলির উত্তপ্ত বাষ্প বহিঃপ্রকাশের জন্য স্বতঃই উদ্বেলিত।

অনেক খবর নিয়ে এসেছে চন্দ্রনারায়ণ।

গান্ধীজী শেষ কথা ইংরেজকে জানিয়ে দিয়েছেন। কুইট ইণ্ডিয়া।

বলেছেন—আমাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

বোম্বাই এবং বোম্বাইয়ের পথে নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এলাহাবাদে হরতাল। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় মিছিলের পর মিছিল। কলেজের সামনে গোলা চলেছে। আহত হয়েছে অনেক। জনশ্রুতি—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর মেয়ের পায়েও গোলা লেগেছে। কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে মিলিটারি বসেছে।

দেশী পুলিশ গুলী বর্ষণে অস্বীকার করেছে। এসেছে গোরা সৈন্য। গোলা ছুঁড়েছে ক'রাউণ্ড। পিটিয়েছে বেদম। জন্তুর মতো পিটোচ্ছে। রাস্তায় যাকে পায় তাকেই।

চন্দ্রনারায়ণ বলে—বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। দেখবেন রাত্তিরে আগুন জ্বলে উঠবে। অন্ধকারে বদলা নেবে না মানুষ?

খানিক বাদে চন্দ্রনারায়ণ চলে যায়। বাবাজী টের পান সেই ভয়।

প্রদ্যুম্ন ভাবে তাই যেন হয়। রাত্রির অন্ধকারে হাসপাতাল, ক্যাণ্টনমেণ্ট যেন ছেয়ে ফেলে বেপরোয়া মানুষ। সেই তুমুল ঝঞ্ঝার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে সেও মিশে যাবে তাদের দলে। তখন গার্ড-রুমে পাগলা-ঘণ্টি বাজিয়ে হাজিরা নিতে কেউ থাকবে না। তারপরও যদি হিসেব নেবার সুযোগ এদের আসে, সে হবে একটা মিসিং নাম্বার। যেমন হয়েছে বার্মায়।

বুদ্ধিটা পরিমলের মনেও লাগে। বলে—তুই একলা কেন, আমরা সবাই।

পালিত বাইরেটা ঘুরে আসে। যদি কোথাও ওৎ পেতে থাকে নাথুরেল।

রাত্রি নটায় রঘুনাথ প্রসাদ আসেন। খুব চুপিসাড়ে বলেন—তুমি দোরের বাইরে বসো তো, পালিত।

গলাটা আরও খাটো করে আনেন রঘুনাথ প্রসাদ।

—তোমরা তিনজন খুব সাবধান বোসবাবু। বাঙালীদের উপর র‍্যাচেল

সাহেবের পুরো অবিশ্বাস। বড়সাহেবকেও সেকথা বললেন। হয়ত তোমাদের পিছনে লোক লাগাবেন।

—তা লাগাক। বাইরের কিছু খবর পেলেন বড়বাবু?—পরিমল প্রশ্ন করে।

—কিচ্ছু না। কোনো ভারতীয় সৈনিক কোনোক্রমেই লাইন থেকে বেরুতে পারবে না। বাইরের সব কাজ করবে গোরা ফৌজ। কোনো বেসামরিক লোককে কোনোক্রমেই ছাউনি এলাকায় আসতে দেওয়া হবে না। অপরিহার্য কারণে যদি কেউ আসে, ভারতীয়দের সঙ্গে তাকে মিশতে দেওয়া হবে না। সংবাদ ব্ল্যাক-আউট করাই যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজী। তোমাকে কিচ্ছু জানতে দেওয়া হবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সামনে ভয়, পিছনেও ভয়।

সুন্দর ব্ল্যাক আউট হয়েছে সংবাদ। ডাল ভাত রুটি। দিনের পর রাত। অফিসের কাজ, রাতের জল্পনা-কল্পনা। কেমন একটা থমথমে ভাব। হাসপাতালের বাইরে যতটুকু দৃশ্যমান সবটাই ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা। তার বাইরে এক বৃহৎ জগতের অস্তিত্ব যেন অতীত স্মৃতি।

বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর নির্জনতার মধ্যে হাসপাতালটা প্রতিদিন তলিয়ে যাচ্ছে। অফিসের সুমুখের পথ দিয়ে কাঠ-মুরগী-ডিমওয়ালা ঠিকেদারদের একার কর্কশ আর্তনাদ আর শোনা যায় না। শাক-সব্জি ডিম-মাংস—সমস্ত ফ্রেশ রেশন বন্ধ। গোরা বন্দুকধারী পাহারায় সাপ্লাই ডিপো থেকে নামিয়ে দিয়ে যায় টিন্‌ড্ স্টাফ। মুখের রুচি মরে যাচ্ছে।

কৌতূহল ও উৎকণ্ঠায় পেট ফুলে ক্রমে বিস্বাদ হয়ে উঠছে জীবন।

সংবাদের সমস্ত সূত্র বন্ধ। চন্দ্রনারায়ণ আর শহরে যায় না। লাইন থেকে বেরুবে না। কর্তৃপক্ষের বারণ।

শহরটা আছে কি নেই কে জানে।

অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিগ্বলয়ে শহরটা যেখানে মিশেছে—উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রত্যুম্ন। একটাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যায় যদি। শুধু শোনা যায় দু-একটা বন্দুক-কামানের গর্জন। উন্মত্ত মানুষের কোলাহল।

চন্দ্রনারায়ণের বিপ্লব কি ছেলেমানুষী কল্পনা?

অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটছে?, বিপ্লব কি থেমে গেল?

হাসপাতাল রক্ষায় নিযুক্ত রয়্যাল ইন্সকিলিন ফিউজিলিয়ার্সের সশস্ত্র কোয়ার্টার

পাঁচদিনের মাথায় উঠিয়ে নেওয়া হল। রাস্তায় আবার দু-একটা যানবাহন চলছে। আর গির্জার পথে যাতায়াত করছে বেসামরিক মানুষ।

পাঁচদিন বাদে হাসপাতালের ক্যান্টিনের উনুন থেকে আবার ধোঁয়া উঠলো।

প্রথমে এলো ডিমওয়ালা বুড়ো ঠিকেদার। ভাঙা একার মন্থর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ শব্দে। নিরিবিলি ঘরের বৈচিত্র্যহীনতায় যেন চঞ্চল হিল্লোল নিয়ে এলো ছোট্ট চড়ুই পাখী।

স্টোর-রুমের এক নিরিবিলি কোণে তাকে বসাল পরিমল।

পাঁচদিন বাদে খবরের কাগজ বেরিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের খবর নেই। সরকারী সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের কঠোর হস্ত।

শোনা কথা অনেক শুনেছে। তাই বলল।

গোমতীর পুলে ট্রেন ফেলেছে। আন্দাজ করেছিল মিলিটারি ট্রেন। কিন্তু সেটা নাকি যাত্রীগাড়ি। বেশি যাত্রী ছিল না। ছিল প্রায় খালি।

লক্ষ্ণৌ-প্রতাপগড় লাইনে অর্ধেক স্টেশন জ্বলছে। দশ-বারোটা থানা দখল করে নিয়েছে সংগ্রামী জনতা। বেনারসে না বেরেলীতে ঠিক জানা যাচ্ছে না। এবং পাটনা জেলায় নাকি সব লোপাট।

—কলকাতা?

—কলকাতার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

—আর এলাহাবাদ?

—ইলাহাবাদ ঠাণ্ডা মেরে গেছে, বাবুসাব। গোরা লোকের বুটের তলায় সারা শহর কাঁপছে। কি রকম পিটিয়েছে লোককে! জন্তু-জানোয়ারকেও এমন পিটোয় না।

ঠাণ্ডা মেরে গেছে এলাহাবাদ! ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল কেন্দ্র।

চারপাইয়ের গোটানো বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়ে পরিমল।

পালিতের চোখ দুটি বিষণ্ণতায় মিইয়ে আসে। নিজের মনকেই যেন সে আশ্বাস শোনায়—এলাহাবাদ অবশ্য গোটা ভারতবর্ষ নয়।

—থাম তুই।—ধমক দিয়ে ওঠে পরিমল।—ইংরেজ শাসনের মেরুদণ্ড ফৌজ। ফৌজকে বাদ দিয়ে কোনো বিপ্লব সফল হতে পারে না, হবেও না।

—ফৌজ কোথায়! সব রঙরুট। ট্রেনিং শেষ না হতেই ঠেলেছে ফ্রণ্টে। আর গোটা দেশকে দাবিয়ে রাখতে আনছে শিক্ষিত গোরা সৈন্য।

—থাম, পরের কথায় ঝংকার তুলিস নে। এখনও যে সৈন্য মজুদ আছে তা দিয়ে তিনটে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালানো যায় জানিস।

—তা চালানো গেল না কেন?—তর্ক তোলে পালিত।

—কি করে হবে? নেতারা ঘটা করে জেলে গেলেন। সংযোগ নেই, সংগঠন নেই। নেতৃত্ব দেবার একটা লোক পর্যন্ত নেই। কে শখ করে আগুনে ঝাঁপ দেবে?

—দেশে বড়রকম কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জাপানী আক্রমণের সুযোগ করে দিতে চান নি গান্ধিজী।—প্রদ্যুম্ন বলে।

—গণ-অভ্যুত্থান তাহলে ফাঁকা আওয়াজ—তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে পরিমল।

—একেবারে ফাঁকা মনে হচ্ছে তোর? সমস্ত দেশ জুড়ে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না। সেই সঙ্গে সৈন্যদলে সামান্যতম আলোড়ন আনা যদি সম্ভব হতো, স্বাধীনতা কয়েক ঘণ্টায় এসে পৌঁছাত আমাদের দোরগোড়ায়। 'কুইট ইণ্ডিয়া' ফাঁকা বুলি হতো না।

প্রদ্যুম্ন প্রতিবাদ করে।

—কুইট ইণ্ডিয়া বিশ্বজনমতের কাছে আমাদের আবেদন। আমাদের আগামী কালের অঙ্গীকার।

এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা ট্রেনে পাঁচদিন।

এবার একলা নয়। সব মিলিয়ে জনা আঠারো। এগার নম্বর চৌকির পুরানো সাঙাত কেশব। সদ্য-ট্রেনিংপ্রাপ্ত শৈলেন। বাকীরা সেপাই ও ফলোয়ার।

কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। প্রথমে যাবে কলকাতায়। সেখানে নির্দেশ পাবে।

যাত্রী-ট্রেন। আগে পিছে দুগাড়ি সশস্ত্র ফৌজের পাহারা। বারো-আনা গোরা ফৌজ। সতর্কতা হিসাবে একখানা পাইলট ইঞ্জিন গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িখানাকে। প্রতাপগড়ের রুটে নয়। ঘুরে সুলতানপুর-ফৈজাবাদ হয়ে গ্র্যাণ্ড-কর্ড।

বেসামরিক প্যাসেঞ্জার হাতে গোনা যায়। মিলিটারির জন্য নির্দিষ্ট কামরা-গুলো ক্যারিয়িং কেপাসিটি মাফিক লোক ঠাসা।

লক্ষ্ণৌ থেকে গোটা দুই স্টেশন পার হয়েই নির্দিষ্ট কামরা থেকে সদল বলে সরে এলো প্রদ্যুম্ন একটা বড় কামরায়। চকখড়িতে লিখে দিলে আই. ও. আর. (Indian Other Ranks)। গোড়া থেকে জনা-চারেক বেসামরিক ভদ্রলোক অধিকার করে ছিলেন কামরাখানা। মিলিটারির আবির্ভাবে ভীত হয়ে উঠলেন। প্রদ্যুম্নর আশ্বাস পেয়ে আবার পা ছড়িয়ে বসলেন।

ট্রেন চলে মন্থর গতিতে। রাত্রে কোনো একটা বড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে এগোতে ভরসা পায় না। হুড় হুড় করে যাত্রীরা নামে। খাবারের খোঁজ করে।

কোন স্টেশন বুঝা যায় না। সাইনবোর্ডগুলো কালো রঙে লেপে একাকার করা হয়েছে ভারত-রক্ষা-ব্যবস্থায়। রাত সাতটায় সেই-যে গাড়ি থেমেছে আর নড়বার লক্ষণ নেই। শোনা যাচ্ছে রাতে আর গাড়ি চলবে না। ক্ষুধার্ত মানুষ-গুলো কিছু মুখে দেবার জন্য আকুল হয়ে ঘুরে মরছে। খাবার নেই। স্টেশনে নেই, বাইরেও নেই। বাইরে হরতাল। স্টেশনের চতুঃসীমায় সশস্ত্র গোরা সৈনিকের পাহারা।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল রেলের পোর্টার। প্রদ্যুম্নর ধাক্কা খেয়ে উঠে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। লোকটা নিশ্চয়ই তার খাকি উর্দিটাকে। ভয় পেয়েছে।

—দোকান কাঁহাবা?—প্রদ্যুম্নর প্রশ্নে আশ্চর্য কণ্ঠে জবাব দেয় লোকটি। শহরে হরতাল। মারের ভয়ে স্টলওয়ালা পালিয়েছে। গোরাদের দেখে এদিকে কেউ আসছে না। চানা বিক্রী করতে তবু একটা লোক এসেছিল আগের দিন। পল্টনলোগ আর যাত্রীরা লুটে-পুটে খেয়ে গেছে সব। পয়সা দেয় নি। কে আসবে!

—সিগারেট?

—হরতাল হুজুর।

—তোমরা কি বিড়ি সিগারেট না খেয়ে আছ?

—আমার কোনো ভাবনা হুজুর। আমি তো খৈনী খাই। বড়মাস্টারবাবু দোকান থেকে লুকিয়ে সিগারেট আনান।

করকরে একটাকা বকশিশের লোভ এড়াতে চাইল না লোকটি।

তিন আনার সিগারেট এগারো আনা, বিড়ির বাণ্ডিল দুআনা। রেলের লোক। লাভটা মুদী একা নেবে এত বোকা নিশ্চয় নয়। তবু পাওয়া গেল।

পাওয়া গেল না শুধু খাবার।

প্ল্যাটফরমের বাইরে রেল-কোয়ার্টারগুলোর সামনে ভিড় জমেছে। প্রচণ্ড হৈচৈ। ওখানে রেল-কোম্পানির ইঁদারা। জলের জন্য প্রত্যুম্নর ভাবনা নেই। সে এখন দেওকীনন্দনদের জাত-ভাই। পুরো হাবিলদার। তার সুখ-সুবিধার জন্য পনেরো জন সেপাইয়ের কারো মাথাব্যথা হবে না এতটা বেপরোয়া হবার নজির ফৌজে নেই। তবু কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেল প্রত্যুম্ন :

আঁজলা আঁজলা জল খাচ্ছে মানুষগুলো। ফৌজী লোক সঞ্চয় করে রাখছে ওয়াটার-বট্‌লে। বেসামরিক লোক পাত্তা পাচ্ছে না। যেন তাদের কোনো হক নেই বালতিটার উপর। আবেদন জানাচ্ছে—ও সেপাইজী, ও হাবিলদার সাহাব—

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যুম্ন। ক্ষুধায় নাড়িগুলো পর্যন্ত হজম হয়ে যাচ্ছে। মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। টাকা পেলে খানকয় রুটি ঘর থেকে করিয়ে এনে দিতে পারে পোর্টারটা।

আবার স্টেশনে আসে। কিন্তু মনের মধ্যে তার আগেই সঙ্কোচ এসে গেছে। গাড়ির কামরায় গ্রাউণ্ডশীটে নির্জীবের মতো পড়ে আছে শৈলেন। কেশব হয়ত বেঞ্চির নীচে একটা পোড়া বিড়ির টুকরোর জন্য হাতড়াচ্ছে। আর বাকী সঙ্গীরা শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে এতক্ষণে হয়ত শুয়ে পড়েছে!

প্ল্যাটফরমের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি বার দুই ঘুরপাক খায়। অবশেষে খুঁজে পায় পোর্টারটিকে।

—তোমার সেই ভিখারী শা'র দোকান থেকে কাঁচা চানা কি সত্তু এনে দিতে পার। বকশিশ পাবে—

—আর হবে না হুজুর। তখনই দরজা খোলে নি। অনেক খুশামোদের পর ঝাঁপের ফাঁক গলিয়ে ফেলে দিল।

—মাস্টারবাবুর কথা বললে—

—প্রাণের চেয়ে কি মাস্টারবাবু বড়? ঐ যে গোরাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক-একটা ছুছুন্দর। মৌকা পেলেই লুঠ করবে। নয়তো ঘরের মেয়েদের উপর জুলুম করবে।

—কে বললে ?

—চারদিকে থেকে তো এই এক খবরই আসছে—

শোনা কথা। হয়ত পোর্টারের অনুমান মাত্র। হয়ত ভিখারী শা'র উৎকণ্ঠা অমূলক। সমস্তই 'হয়ত'। নিশ্চিত কিছুই নেই।

এই দুই দিবস ব্যাপী রেলযাত্রায় প্রায় পৌনে দুশো মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে। তার মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছে গোটাচারেক অগ্নিদগ্ধ স্টেশন। তার মধ্যে কোনো 'হয়ত' নেই।

ট্রেনখানা স্বাভাবিক পথ বর্জন করে ঘুরপথে চলেছে। সর্ববিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তবু দিনে একশো মাইল এগোতে পারছে না। এর মধ্যেও 'হয়ত' নেই।

তাহলে বিপ্লব শেষ হয় নি এখনও। মিথ্যাই হতাশ হয়ে পড়েছে পরিমল।

কিন্তু যুদ্ধকালীন বিশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের কেউ এখনও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল না।

সংশয় সেইখানেই।

সকাল চারটায় ইঞ্জিনের ভোঁস ভোঁস শব্দে সমস্ত গাড়িটায় সজীবতার সাড়া আসে। আবার গাড়ি চলে। সেই মন্থর গতি। বাইরের দৃশ্যের উপর কারো চোখ নেই। কামরায় শুয়ে রয়েছে যে যার মতো। অভুক্ত—নির্জীব। বেলা এগারটা নাগাত এক মকাই-ক্ষেতের পাশে এসে গাড়ি দাঁড়াল। নির্দেশ-সংকেতের জন্য। পঙ্গপালের মতো মকাইক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষগুলো। দেড়-দু বিঘে জমি মিনিট দশেকে তছনছ। মাথায় হাত দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলো চাষীরা।

বেলা চারটায় মোগলসরাই প্ল্যাটফরমে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

ডি. সোরাবজীর দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। ফোর্থ ক্লাস ফুল। যে বসতে পেয়েছে তার পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পরবর্তী দাবিদার।

দু কোর্স ডিনার খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে কামরায় ফিরে আসে প্রদ্যুম্ন। কেশবের নেতৃত্বে সিভিলিয়ান ভদ্রলোকগণ সহ অন্তরা সব বাজারে গেছে আহার-অন্বেষণে। বাসদেও পাহারায়।

একজন বাঙালীবাবুর আবির্ভাব হয়েছে কামরায়। তাঁর সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়েছে বাসদেও।

প্রদ্যুম্ন এসে বাসদেওকে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়।

—ওরা খাবার নিয়ে আসবে, বাবুজী।—বাসদেওয়ের কণ্ঠ নির্লিপ্ত।

—আনে ভালো। কিন্তু গতরটা একটু নাড়ালে পারতে না? তুমিও উপোস করে আছ। কালকেও জুটবে কিনা কে জানে।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসে বাসদেও।

—ছাপরা জেলার লোক। কিছু না থাকলেও জানবেন আধসের কি পোয়াটাক সত্তু পোটলায় আছে।

একটা তত্ত্ব জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। সমস্ত কম্পার্টমেণ্ট খালি থাকতেও কেন এই গরমে বাঙ্কের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকেছে বাসদেও। এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় প্রদ্যুম্নর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে আসে। কিন্তু মুখ খোলে না।

মুখ খোলেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

—আপনি বাঙালী?

—হ্যাঁ।—রুক্ষকণ্ঠে জবাব দেয় প্রদ্যুম্ন।

যেন বিব্রতবোধ করেন ভদ্রলোক। ইতস্তত করে বলেন—আপনাদের গাড়িতে উঠলাম বলে কি বিরক্ত হলেন?

নিজের অকারণ রূঢ়তায় প্রদ্যুম্ন লজ্জা পায়। সহজ হাসির চেষ্টায় বলে—মোটেই না। বরং এদিককার অনেক তাজা খবর পাওয়া যাবে আপনার কাছে।

ভদ্রলোক রেলে কাজ করেন। যাচ্ছেন কলকাতায়। শ্বশুরালয়ে। গৃহিণী, ছেলেমেয়ে ওখানে রয়েছে। কোনো খোঁজখবর নেই। চিঠিপত্র বন্ধ। টেলিগ্রামেও জবাব আসে না। রেল-স্টাফের যোগাযোগে একখানা চিঠি এসেছে। ছেলের টাইফয়েড। দশ-এগার দিন হল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

—গিয়ে দেখবেন, ভালো হয়ে গেছে।—সান্ত্বনা দেয় প্রদ্যুম্ন।

—আপনার কথাই যেন সত্যি হয়। তবু আমি বাপ তো। কি যে অশান্তি, বুঝতে পারবেন না।

অশান্তিভোগ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হয়েছে। তিনদিন ধরে গাড়ির আশায় নড়তে পারছেন না স্টেশন থেকে। টেলিগ্রাফের তার কাটা। টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে না। গাড়ির খোঁজ নেই।

—এই তো গার্ড সাহেব নামলেন গাড়ি থেকে। এর ঘণ্টা চারেক আগে দিল্লী থেকে যে গাড়িটা ছেড়েছিল তার খোঁজ নেই। আগের দিন বিকালেও

ছেড়েছে একখানা ট্রেন, তারও হদিশ নেই। দাঁড়িয়ে আছে, শুয়ে পড়েছে, না আগুনে জ্বলছে, কে জানে!

ভদ্রলোক কাঁচি-সিগারেট ধরালেন। একটা এগিয়ে দিলেন প্রদ্যুম্নর দিকে।

—খোঁজ নেই, মশাই। গোটা দেশটারই খোঁজ নেই। সমস্ত খবর অন্ধকারে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজ খুলুন। প্যাঞ্জার মুভমেণ্ট করে এগিয়ে যাচ্ছেন ওয়াভেল। জার্মানরা মস্কো থেকে পিছু হটেছে। স্ট্যালিনগ্রাডে গৌরবপূর্ণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে। লেলিনগ্রাড নতিস্বীকার করে নি। ফ্রান্সের উপকূলে ক'ডজন বোমা ফেলেছে ইংরাজ। সমস্তই ছাপা হচ্ছে ফলাও করে। তলিয়ে যাচ্ছে কেবল আমাদের দেশের খবর।

ভদ্রলোক কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন।

—জানেন মশাই, আরা জেলায় ইংরাজ ফৌজ আর দিশী পুলিশে পাল্টা হয়ে গেছে। দেখছেন না, দিশী ফৌজ একটাও নেই। সাহাবাদ-প্রতাপগড়ে প্রায় সব ক'টা থানা বিদ্রোহীরা দখল করে নিয়েছে। রেল-লাইন তুলে ফেলেছে। দেখছেন না গাড়ি চলছে না ও-লাইনে।

কেশবরা ফিরে এলো। নিরাশ হয় নি। এমনকি খাবারও এনেছে বাসদেওয়ের জন্যে। তা ছাড়াও একতাল সারপ্লাস রুটি। আলুর চুখা।

রাতটা কাটাতে হবে এখানেই।

কেশব তাস বের করে।

আবার দিন আসে। আবার শুরু হয় চলা।

বেলা চারটায় গয়া এসে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেনখানা।

প্রায় পঞ্চাশজন গোরা সৈন্য স্টেশনটা আগলে রেখেছে। কারো প্ল্যাটফরমে নামবার হুকুম নেই। ভাদ্রের বেলাশেষের রৌদ্রের তাপ এখনও যথেষ্ট। প্রচণ্ড গুমোট।

খাঁ খাঁ করছে গয়া স্টেশন। বুটের খটাখট শব্দ আর গুমোট নিস্তব্ধতা।

রাত্রের রুটিগুলো ভাগ করে মাথা পিছু দেড়খানাও পড়ে না। বাসদেওয়ের সত্তুর পোটলা বের করে আনল প্রতাপ সিং। আধসেরটাক অবশিষ্ট আছে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। উঠে গেল চক্ষের নিমেষে। বাঙ্ক থেকে নেমে এল বাসদেও। মুখে হাসি। সর্বহারার হাসি।

ট্রেন আবার চলল সকাল পাঁচটায়।

গ্র্যাণ্ড কর্ডের পাহাড়ের গায়ে পল্টনের তাঁবু পড়েছে।

পাহাড়ের খাড়িগুলোর উপর ছোট ছোট ব্রিজ পাহারা দিচ্ছে গোরা সৈন্য।

বেলা বাড়ছে।

গাড়ির ভিতরে মানুষগুলো শুয়ে পড়েছে যে যার মতো।

চেঁচিয়ে উঠলো প্রতাপ সিং।

—গিরা দিয়া, গিরা দিয়া, বিলকুল গিরা দিয়া।

স্লোপের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে মালগাড়ি। পনরো-ষোলটি বগির একটিও দাঁড়িয়ে নেই। ভেঙেচুরে মালপত্র ছড়িয়ে একাকার।

গাড়ি চলেছে শ্লথ গতিতে।

গোমো পার হয়ে গাড়ির গতি বাড়লো।

এইভাবে পাঁচটি অভুক্ত অস্নাত একঘেয়ে ক্লান্তিময় দিনের শেষে গাড়ি পৌঁছাল হাওড়ায়। রাত এগারোটায়। প্ল্যাটফরমে রাত কাটাতে হবে।

কলকাতার অলিগলি সব চেনা। ধুতি-কামিজ পরে বেরিয়ে পড়ে প্রদ্যুম্ন। কলেজ স্ট্রীটের এক আত্মীয়-বাড়ির উদ্দেশে।

শান্ত হয়ে গেছে কলকাতা।

ব্ল্যাক-আউটের কলকাতা। জাপানী বোমার ভয়ে আদ্ধেক লোক পলাতক। রাস্তায় অবিরাম মিলিটারি ট্রাকের স্রোত। ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড কার। আকাশে জঙ্গী বিমানের পাহারা।

অন্ধকার। জাপানী বোমার ভয় আর ফৌজের দৃপ্ত বুটের তলায় রাত্রির কলকাতার চোখে ঘুম নেই।

এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে গায়ের ঘাম মোছবার সময় পায় নি প্রদ্যুম্ন। সেই রাত্রেই ট্রাকে তুলে পাঠিয়েছে রেল-স্টেশনে। দিল্লী মেল এসেছে পরের দিন সকাল আটটায়।

যে প্রয়োজনে এত তাড়াহুড়ো, হঠাৎ সেই প্রয়োজন ঝিমিয়ে পড়ায় আশ্চর্য লাগে। সবচেয়ে বিরক্তিকর উদ্বেগ—কোথায় তারা যাবে? সামনে—সীমান্তে দুপক্ষের টহলদারী সৈন্যে সংঘর্ষ। ম্যালেরিয়া ও আমাশয়। আর পশ্চাতে এক নেতৃত্বহীন গণ-অভ্যুত্থানের আগুনে অর্ধেকটা দেশ জ্বলছে। কোন অগ্নিকুণ্ডের হবি হতে এসেছে তারা?

নির্দেশের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। যে কোনো মুহূর্তে আসবে সেই নির্দেশ। বাইরে যাবার তাই ছুটি নেই।

হয়ত যাচ্ছে কোনো এক মরণ-যজ্ঞে।

আত্মীয়-স্বজন ছড়িয়ে আছে শহর কলকাতায়। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের উপায় নেই। চিঠি লিখলে হয়ত তাদের কেউ-না-কেউ দেখা করতে আসবে। কিন্তু··· ?

কিন্তু?—প্রশ্নটা আত্মকুণ্ঠার। এখানে সে অতিথি। সাধারণ সৌজন্য তার পাওনা নয়। খাটিয়ে নিচ্ছে আঠারো আনা। অথচ সমগোত্রীয় অন্যদের সঙ্গে তার তফাতটা গৃহভৃত্য আর দিনমজুরের। হাবিলদার ক্লার্কদের মেসে তাদের জায়গা হয় নি। খাবারের জন্য সাধারণ সৈন্য ও ফলোয়ারদের সঙ্গে লাইন দিয়ে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাস—একশ-আশি পাউণ্ড তাঁবুতে মৃত্তিকা শয্যায়। তাদের দলের সেপাইদের সঙ্গে গাদাগাদি করে। এই অপমানিত অবস্থাটা আত্মীয়-স্বজন জেনে ফেলুক তা যেন চরম লজ্জা।

হপ্তা কেটে যায়। কিন্তু যে নির্দেশের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হচ্ছে সেই নির্দেশ আর আসে না।

শৈথিল্যের কারণ প্রদ্যুম্ন পরে জেনেছিল।

আগস্ট-আন্দোলনের ব্যাপকতার মুখে কলকাতার সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের সংযোগ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করেছিলেন সরকারী কর্তৃপক্ষ। কলকাতাকে ঘাঁটি করে পূর্বসীমান্তে যুদ্ধ-সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা অসম্ভবপ্রায় হয়ে উঠেছিল। বিকল্প পথ খুঁজছিলেন ভারত সরকার। লক্ষ্ণৌ মুজাফরপুর কাটিহার পার্বতীপুর হয়ে আউধ ত্রিহুত রেলপথে সৈন্য ও সরবরাহ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্রাথমিক সূত্রপাত হিসাবে এই ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে ১৫২ নম্বর লাইন অব কম্যুনিকেশান এরিয়ার পত্তন হয়েছিল কলকাতায়। ভ্রমণরত সৈনিকদের চিকিৎসার প্রয়োজনে পার্বতীপুর এবং কাটিহারে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি

(Detachment) হাসপাতাল স্থাপনের জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে সাত-তাড়াতাড়ি পাঠানো হয়েছিল তাদের।

দিন সাতেক বাদে এসে জুটলেন ক্যাপ্টেন শঙ্করন। পরবর্তী নির্দেশ আসবে তাঁর বেলায়ও। ডাক্তার মানুষ। আত্মবিশ্বাস কম। সাহস ততোধিক কম। যুদ্ধের কোন বিভীষিকার মধ্যে গিয়ে পড়বেন সেই ভাবনায় এখন থেকেই অস্থির।

তাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন শঙ্করনের ভাগ্য যে এক সূতোয় ঝুলছে আগে জানা যায় নি।

জানা গেল দুদিন পর।

ট্রাক এলো। বেরুতে হল।

হু হু করে ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছে। বরানগর ব্রিজ পার হয়ে শহরতলীর পথে। কোথায় যাচ্ছে কারো জানা নেই। ক্যাপ্টেন শঙ্করনেরও না। জানেন ক্যাপ্টেন হ্যারিস। সেদিন সকালে এসেছেন। বসে আছেন ড্রাইভারের পাশে। দীর্ঘাকৃতি গম্ভীর মানুষ। গোঁফ-জোড়াটা দুটি প্রমাণসই সম্মার্জনী। চেহারাটাকে ও দুটো আরও জাঁদরেল করেছে। সম-পদাধিকারের দাবিতে প্রশ্ন করেছিলেন ক্যাপ্টেন শঙ্করন। ছোট্ট জবাব পেয়েছেন।

—জানা কি একান্ত দরকার?

প্রশ্নটা চাপা পড়েছে ওখানেই। কিন্তু শেষ হয় নি। উৎকণ্ঠায় কারো মুখে হাসি নেই। কথা নেই।

ট্রাক এলো ব্যারাকপুর স্টেশনে। ট্রেন আসবার মিনিট পাঁচেক আগে। সংরক্ষিত কম্পার্টমেণ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর। অবশ্য অফিসার দুজন গেলেন প্রথম শ্রেণীতে।

ট্রেনে উঠে সবাই যেন মুক্তি পেল। উৎকণ্ঠা থেকে নয়। রাশভারি লোকটার সান্নিধ্য থেকে।

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস। চট্টগ্রাম তাহলে তারা যাচ্ছে না। তবে কি ইম্ফল? পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে। সমস্ত কথাবার্তায় মাঝখানে ঐ প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসছে।

রানাঘাটে খোঁজ নিতে এলেন হ্যারিস।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না কেশব। ঘুরিয়ে তোলে কথাটা।

—পার্বতীপুরে কি আমাদের গাড়ি বদল করতে হবে স্যার?

—না।

রাত্রি আটটায় ট্রেন পৌছাল পার্বতীপুর। হুকুম হল নামবার।

তিনখানা আই. পি. টেন্ট খাটানো রয়েছে রেলের মাঠে। সকলের শোবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। একজন সেপাইয়ের কাঁধে বিছানা চাপিয়ে ক্যাপ্টেন শঙ্করন চলে গেলেন স্টেশনে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-বিশ্রামশালায়। গেলেন না হ্যারিস। সকলের মাঝখানে গাদাগাদি করে তিনি বিছানা পেতে নিলেন।

রাত শেষ হল এক বর্ষণ-সিক্ত সকালে। কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে রাস্তাঘাট। রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটের মাঠ। ক্যাপ্টেন হ্যারিস করিৎকর্মা লোক। সকালবেলাই খোলা হল হাসপাতাল। মালপত্র তখনও ওয়াগন থেকে খালাস হয় নি।

শঙ্করন বসলেন হাসপাতালে।

লোকজন নিয়ে ওয়াগন খালাস করতে গেলেন হ্যারিস।

কেশবকে বলে চা খাবার নাম করে বেরুল প্রদ্যুম্ন।

ভারতীয় কেটারিং-এ সবে চা নিয়ে বসেছে। দরজায় দাঁড়ালেন হ্যারিস। চোখ ঘুরিয়ে ভিতরটা একবার দেখে নিলেন। সোজা এগিয়ে এলেন প্রদ্যুম্নর টেবিলে। মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু নোট-বুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়লেন। পেন্সিলে লিখলেন :

মেজর অ্যাডামসন, এই আপনার লোক।

—চা খেয়ে স্টেশনের দোতলায় এঁর সঙ্গে দেখা করবে। ব্যস্ত হবার দরকার নেই!

ঠাণ্ডা মিহি গলা।

বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন হ্যারিস।

১৫২ নম্বর লাইন অব কম্যুনিকেশন সাব এরিয়া হেড কোয়ার্টার।

প্রদ্যুম্নদের দুদিন আগে এসে পৌছেছে।

স্থান নিয়েছে স্টেশনের দোতলায়।

মেজর অ্যাডামসন চিরকুটটার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

—আমার লোক এখনও এসে পৌছায় নি। কয়েকদিন তোমাকে কাজ করতে হবে। টাইপ জানো?

—সামান্য।

এবং কাজও খুব সামান্য। অ্যাডামসন বেরিয়ে গেলেই ছুটি।

পার্বতীপুর স্টেশনের দোতলায় অপরিসর দুখানা ঘর। গোটা আট অফিসার। দুজন কেরানী। পিয়ন, চাপরাসী, ফাইল, ফরম। দমবন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। সকলের বসবার টেবিল দূরে থাক, চেয়ারও নেই। বেরিয়ে গিয়ে ভিড় কমানো কাজের সহায়ক। প্ল্যাটফরম এরিয়ার বাইরে না গেলেই হল। অর্থাৎ পিয়ন দিয়ে ডাকলে যাতে চট করে পাওয়া যায়।

স্টেশনে রকমারি মানুষের আসা-যাওয়া। পুরুষ-মেয়ে, তরুণ-বৃদ্ধ। গাড়ি আসছে যাচ্ছে। কৌতূহলী যাত্রী মুখ বাড়াচ্ছে জানালা দিয়ে। খুঁজছে খাবার কিংবা ফেরীওয়ালা। এক বিচিত্র হিউমার। নিস্তব্ধতাকে সুড়সুড়িতে জাগিয়ে দিয়ে ট্রেন এলো। বেধে গেল হাঁকডাক হুটোপুটি। মাল নিয়ে ঝগড়া। দরদস্তুর। বিদায়, অভ্যর্থনা। বেশ জেঁকে উঠল আসর। তারপর 'কু—উ—' বলেই ছুটে পালাল অন্য কোনোখানে।

প্ল্যাটফরমে গাড়ি এলেই প্রদ্যুম্ন নীচে নেমে আসে। অ্যাডামসন থাকলেও। অন্তত দুচার-পাঁচ মিনিটের জন্য! প্ল্যাটফরমের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হেঁটে যায়। একবার দুবার। হাতে সময় থাকলে ততোধিক কাল। কেন সে নিজেই জানে না। হয়ত আশা করে, কোনোদিন ভেসে উঠবে একখানা পরিচিত মুখ। কিংবা কোনো অপরিচিতার একখানা সুন্দর মুখ।

সে শুধু প্রত্যাশা করে। কি লাভ জানে না।

কাজ। অবসর। আর স্টেশনের বহু জাতি বহু শ্রেণীর ভিড়ের মাঝখানে সঙ্গীহীন ভালো-না-লাগা।

প্রত্যেকটি দিন যেভাবে আসছে, এমনটি সে কোনোদিন চায় নি। এই বাস্তব অবস্থাকে সে অস্বীকারও করে না। অথচ কোথায় যেন শূন্যতা থেকে যাচ্ছে।

দুপুরবেলাটা একলা শুয়ে কাটায় তাঁবুতে। সংলগ্ন রেল-কোয়ার্টারগুলোতে মানুষের আসা-যাওয়া। স্নেহ-প্রেম-মমতায় সঞ্জীবিত। সমাজ-জীবনের এক আকুতি যেন ওখান থেকে ইশারায় তাকে বিদ্রূপ জানায়। তার এই যান্ত্রিক জীবন—বুট, পট্টি, ফেল্টের বন্ধনের মধ্যে আর্তনাদ করে। শরতের রোদ ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আকাশের কোণ বেয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে যায়। রৌদ্রতপ্ত আই. পি. টেন্টের শয্যায় তার পরিচিত পৃথিবীর মানুষ দুরান্তের ছায়াছবির মতো স্বপ্নের ওপরে ঘোরাফেরা করে। অপরিচয়ের মধ্যে সরে যাচ্ছে সব। এই চলমান

পৃথিবী। আর সে অচল পঙ্গু। খাকী উর্দির আলিঙ্গনে শাশ্বত কালের জন্ম বাঁধা পড়ে গেছে। নিঃশেষে নিজেকে নিয়ে যে তলিয়ে যাবে তার কোনো উপায় নেই।

শঙ্করন একটা গোটা আই.পি. টেণ্ট খাটিয়ে নিজের সংসার পেতেছেন। কিন্তু হ্যারিস এ তাঁবু থেকে এখনও বিদায় নেন নি। টুক করে আসেন। পোর্টম্যাণ্টো খুলে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে হুস করে কেটে পড়েন। মুখে কথাটি নেই।

দুপুরের অবসরে গা এলাতে আসে কেশব। অতীত জীবনের স্মৃতি মন্থন করবে। এই বিস্বাদ একঘেয়েমীকে যেন অতীতের রসে লেহন করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। গর্বিত আত্মতৃপ্তিতে তার চোখ দুটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যে কত নিরর্থক—শ্রোতার অনুভবের দিকে তাকাবার খেয়াল নেই।

দুপুরে শৈলেন তাঁবুতে বড় একটা থাকে না। রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটের হলটি ওয়ার্ড। তার মধ্যেই দুটো টেবিল পেতে অফিস সাজিয়েছেন হ্যারিস। শঙ্করনের সঙ্গে ভাগা-ভাগি করে একটা নিজে ব্যবহার করেন। অপরটিতে বসে কেশব ও শৈলেন। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত অফিস। দুপুরে একঘণ্টা খাবার ছুটি। খেয়ে উঠেই পান খাবার নাম করে শৈলেন স্টেশনে চলে যায়। ওটা একটা অজুহাত। এক খিলি পানের জন্য দুটো সেপাই পাঠাতেও তার বাধা নেই। প্রত্যুম্ন জানে এই গতিশীল জগৎটাকে সর্ব-দেহ-মন দিয়ে স্পর্শ করে আসে শৈলেন। বাইরের আলো-বাতাস প্রবেশের ঐটুকুই মাত্র গবাক্ষ।

শৈলেন যেদিন স্টেশনে যায় না, বালিশের নীচে থেকে তাস বের করে।

—আয়, দুহাত কাট-থ্রোট হয়ে যাক।

কেশবের জিহ্বার গোড়ায় তখন হয়ত আরেকটা কাহিনী কিলবিল করে।

লাঞ্চের পর অফিস তিনটায়। হুকুম হল জরুরী চিঠি নিয়ে যেতে হবে ব্যারাকপুর। রাত নটার ট্রেন। ফেরবার ট্রেন ব্যারাকপুর থেকে পরদিন এগারোটায়। নির্দিষ্ট ট্রেনেই ফিরতে হল।

যেন পথ চেয়ে ছিলেন অ্যাডামসন। বিকেলের অলস আলোয় ট্রেনের কামরা থেকে দেখা গেল প্ল্যাটফরমে হ্যারিস-অ্যাডামসনের যুগল মূর্তি।

আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁবুতে ফিরলেন হ্যারিস। চটপট বিছানা বাঁধলেন।

স্বাভাবিক মৌনতায়। পোর্টম্যাণ্টো থেকে হুইস্কির বোতল গ্লাস বের করলেন। চারপাইয়ের নীচে থেকে বের করলেন প্রত্যুম্নর গ্লাস ও জলের বোতল।

ছোট্ট একটা পেগ এগিয়ে দিলেন।

—যাচ্ছি। সৌভাগ্য কামনা করি।

—আশা করি আবার সাক্ষাৎ হবে।

—ফৌজে এ হয়ত অলীক আশা।—হাসলেন হ্যারিস।

দশ মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স সেপাইয়ের কাঁধে এবং নিজে মাল বহন করে বেরিয়ে গেলেন হ্যারিস। কেশব শৈলেন তাঁবুতে নেই। শুভেচ্ছা রেখে গেলেন তাদের জন্য।

ধুবড়ী যাচ্ছেন হ্যারিস। গোপনীয়। তবু কথাটা তাকে নির্ভর করে বলতে পারলেন।

টেন্ট নির্জন। শরীর রাত্রির অনিদ্রায় ক্লান্ত। হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত প্রত্যুম্ন। কিন্তু এক বিষণ্ণ অনুভূতি বেলাশেষের রোদ্দুরে উদাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই তাঁবুতে একজন গোটা ক্যাপ্টেন, তাও ইংরাজ, উপদ্রবের মতো এই ক'দিন বাস করলেন। যখন চলে গেলেন, প্রীতি দিয়ে তাঁবুর বাতাস স্নিগ্ধ করে রেখে গেলেন। জাতি, ধর্ম, এমনকি পদাধিকারের অহংকার তাঁর মানবিক শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি। অথচ প্রথম দিন থেকেই আই.ও.আর.দের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছেন শঙ্করন। তাদের মতোই কোনো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ভারতীয়।

ছোট্ট স্টেশনটুকু যেন এক বৈচিত্র্যের জলসা-ঘর। আমীর থেকে আতুর-ফকিরের শুভ সঙ্গম। শ্মশানের শেষ বিক্তৃতায় নয়। যে যার জৌলুসের ফানুস উড়িয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে আসেন। তীক্ষ্ণ তীরের মতো বাতাসের বুকে আর্তনাদ তুলে ছুটে আসে গতিশীল আমন্ত্রণ। দূর-দূরান্তের রোমাঞ্চ-সঙ্কেতের মধ্যে আবার মিলিয়ে যায়।

স্টেশনের অবরুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক ক্রিয়াশীলতায় জীবনের গতি আবার কারো জন্য থমকে দাঁড়ায়। সকাল-সন্ধ্যার একঘেয়ে পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে প্রয়োজনের রূঢ় ভ্রূকুটি পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত রোমাঞ্চ মুছে দিয়ে তাদের মুখের উপর অকরুণ ছায়া ফেলে।

পরিধানে রেলের সাদা কোট, বয়স পঞ্চাশবর্তী, ভদ্রলোক গায়ে পড়েই

আলাপ করলেন। মুখে অবসাদের ছায়া। কুণ্ঠিত বিনয়ে আহ্বান জানালেন কেটারিং-এ এক কাপ চা খাবার জন্য।

প্রদ্যুম্ন প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

ভদ্রলোক নামটাও জেনে রেখেছেন। এক গাল হেসে বলেন—কদিন ধরেই ভাবছি আলাপ করব। কিন্তু মিলিটারি পোশাকটা তো কম বালাই নয়। দেখলেই ভয় লাগে।

আবার হাসেন।

বলেন—মানুষের মন জিনিসটা পোশাকে বদলায় না। ওটা আমাদের ভ্রম। বাঙালীর দেহটাকে যে সজ্জা দিয়েই মোড়ানো হোক, মনটা বাঙালী থাকবেই।

ভদ্রলোকের নাম অনাথবন্ধু চৌধুরী। ট্রেন একজামিনার। পূর্বপরিচিত নন। এ সংশয়টা প্রদ্যুম্নর মনে জেগে উঠেছিল।

—একটা ডাবল পোচ আর একটা করে চা দাও হে। ঢালাও ফরমাশ দেন অনাথবাবু।

—চা-ই যথেষ্ট। অযথা আবার পোচ কেন?

—পেট ছাড়া সমস্তই অযথা মশাই।

—না, তা নয় একটু আগেই খেয়েছি কিনা।

—আপনাদের বয়সে খেয়ে হাত ধুতে গিয়ে আবার ক্ষিদে পেয়ে যেতো। তখন খেতেও পারতাম। সেরটাক মাংস এক পাতে বসেই তুলে দিয়েছি। জিনিসপত্রও সস্তা ছিল। এ লাইনে একটাকায় একটা গোটা পাঁঠা পাওয়া যেতো। একগণ্ডা ডিম দুপয়সার বেশী নয়। কি দিন যে গিয়েছে—!

আক্ষেপের সূত্র ধরে দুপয়সার ডিম থেকে সেকালের খেলাধূলা, আপ্যায়ন, লৌকিকতা পার হয়ে আসেন হাল আমলে।

—এই যুদ্ধের বাজারে আমাদের হয়েছে মৃত্যুদশা। বউয়ের কাপড় নেই, ছেলের স্কুলের মাইনে বাকী। সমস্ত দিন শুকনো মুখে চাকায় হাতুড়ি মারছি। আর ট্রাফিকের লোকদের রামরাজত্ব। বউয়ের গয়না, শালীর তত্ত্ব। যুদ্ধটা আরও দুশো-পাঁচশো বছর চললেও তাদের ক্ষতি নেই।

—আমাদের কথাটাও সেই সঙ্গে ভাবুন। কার সাম্রাজ্য কে কেড়ে নিচ্ছে, আর কটা টাকার জন্য আমরা জীবন বিক্রী করছি। সমাজে অদৃষ্টের বলি হিসেবে কিছু লোক তো থাকবেই।

—শুধু আপনারা কেন, আমারাও এখন ঐ এক পথের পথিক। এই তো দেখুন, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ায় নাম লিখিয়েছি আজ দুমাস। কিন্তু না পেয়েছি পোশাক, না পাচ্ছি অ্যালাউয়্যান্স।

—বুড়ো বয়সে আপনাকেও লেফট-রাইট করতে হচ্ছে। কি মর্মান্তিক পরিহাস দেখুন।

দর্শনের রাস্তায় অনাথবাবু যান না। প্রাণখোলা সারল্যে হেসে উঠেন।

—সে বড় মজার ব্যাপার, বোসবাবু। কাটিহারে মেথরদের এক প্লাটুন হয়েছে। শালাদের মরণ। তাড়ি খেয়ে সব বুঁদ হয়ে থাকবে। লেফট-রাইটের কে হুঁস রাখছে। পা কিছুতেই মেলে না। বাউলে সাহেবকে বোঝানো হল, আংরেজী কথার মানে খেয়ালে রাখতে পারছে না। সাহেবেরও পরিষ্কার মাথা। হুকুম দিলেন এক পায়ে বেঁধে দাও ঘাস, আরেক পায়ে বিচালি। হলো কিছুদিন 'ঘাস বিচালি'—'ঘাস বিচালি'। কিন্তু ঘাস-বিচালি শুনে কি তাড়ির নেশা কাটে, না কারো মগজ খুলে যায়!

অনাথবাবু হাসলেন হো হো করে নিজের রসিকতায়।

চা পান করে বাইরে এলেন দুজনে। দূরে ডাউন লাইনে সিগন্যাল পড়েছে। সাইডিংয়ে আমেরিকান সৈন্য বোঝাই স্পেশাল। ধুবড়ী যাচ্ছে। বয়লারে জল নেবার কলের নীচে উলঙ্গ হয়ে স্নান করছে আমেরিকান সাহেবরা।

দুপা এগিয়েই থেমে গেলেন অনাথবাবু।

—খুব বিপদে আছি, বোসবাবু। আপনি যদি উদ্ধার করেন!—কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে করুণ আবেদন। কেমন যেন হেঁয়ালি।

—আমি?

—বাড়িতে সব কটার ম্যালেরিয়া। কুইনিন পাওয়াই যায় না। ব্ল্যাকে এক আউন্স ত্রিশটাকা। ধার-হাওলাত করে যাও-বা আধ আউন্স আনালাম, ডাক্তার বলছে চিরতার জলে ভিজানো এরারুট। কুইনিনের লেশমাত্রও তাতে নেই।

ভূমিকাটুকু কুইনিনের জন্য। চাইলেনও। বললেন,—দাম লাগুক তাতে দুঃখ নেই, তবু জিনিসটা খাঁটি পাই।

অনাথবাবুর অমায়িক সরল হাসিখুশী একমুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রদ্যুম্নর মনে অনেকখানি অন্ধকার যেন গুলিয়ে ওঠে। অথচ ভদ্রলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। অসহায় চোখ দুটিতে লোভের চেয়ে অধিকতর কাতর প্রার্থনা।

অন্যায়ের সংস্কারের চেয়ে চক্ষুলজ্জার বাধাও কম নয়। প্রত্যুম্ন 'না' বলতে পারে না। আবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াও সম্ভব হয় না। বলে—আমার হাত নেই।

—হাত যার থাক, আপনি চেষ্টা করলে আমার মহৎ উপকার হয়।

—ওদের বলে দেখবো।

দায়সারা জবাব দিয়ে এগিয়ে আসে প্রত্যুম্ন।

দুপুরবেলা আহারের সময় অনাথবাবুর কাহিনী শৈলেন ও কেশবকে শোনায়। শোনায় মানুষের অন্যায় লোভ উপপাদ্য করে শ্লেষের ভঙ্গিতে।

—তুই কি বললি ?—উপসংহারের মন্তব্যটুকু শেষ হওয়ার ধৈর্য রাখতে পারে না শৈলেন।

—বলব কি। না বললাম।

—তুই একটা ইডিয়ট। মাল যাবে মিলিটারির, পাঁচজন লোকের সঙ্গে পরিচয় প্রতিপত্তি করে নিতে দোষ কি ?

—তা ছাড়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতিবেশী, তাঁবুর পিছনের বাড়িটায় থাকেন।—কেশবের কণ্ঠেও শৈলেনের সমর্থন ধ্বনিত হয়।

—পরিচয় থাকলে কখনো-সখনো মুড়ি-মোয়াটা আসতেও পারে।

—শুধু মুড়ি-মোয়া—

—আর কিছু তুই দেখ না চেষ্টা করে।

শৈলেনদের আহারের ছুটি একঘণ্টা। তারপর আবার ছটা পর্যন্ত অফিস। অনাথবাবুও হয়ত খেতে গেছেন। তা না হলে অনাথবাবুর খোঁজে শৈলেন স্টেশনটা তখুনি ঘুরে আসতো কিনা বলা যায় না।

চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে প্রত্যুম্ন। সমস্ত দুপুরটা তার ছুটি। রাত্রে নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে যেতে হবে ব্যারাকপুর।

অফিস থেকে আধঘণ্টা আগেই ফেরে শৈলেন। ছুটি নিয়েছে। তর সইছে না। আলাপ করিয়ে দিতে হবে। প্রত্যুম্নকেও সঙ্গে যেতে হয়।

গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অনাথবাবু। প্রত্যুম্ন পরিচয় করিয়ে দেয়। শৈলেনকে নিয়ে অনাথবাবু চা খেতে যান। উপরোধ সত্ত্বেও প্রত্যুম্ন যায় না। সাতটায় অফিসে আসবেন অ্যাডামসন। ওপরে উঠে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এসে গেছেন অ্যাডামসন। আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ সেরে নীচে নেমে আসে। স্টেশনে তেমন ভিড় নেই। লালমণি হাটের গাড়ি

বেরিয়ে গেছে—অল্প কিছু যাত্রী অপেক্ষা করছে কলকাতাগামী ট্রেনের জন্য। অনাথবাবু হয়ত শৈলেনকে নিয়ে কেটারিং জমিয়ে রেখেছেন। ওদিকে যেতে ইচ্ছে হয় না।

রেল-ওভারব্রিজের উপর থেকে নাম ধরে কে ডাকছে।

শৈলেন।

খুশীতে ডগমগ করছে শৈলেন।

—জানিস, ভদ্রলোক কত কৃতজ্ঞতা জানালেন! চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন কালকে সন্ধ্যায়।

স্বার্থ সৌজন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কত চট করেই না তার কথা ভুলে গেলেন অনাথবাবু। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল প্রদ্যুম্ন। তবু বন্ধুর খুশীতে নিজের ক্ষুণ্ণতা প্রকাশ করতে পারে না। কৌতুকের কণ্ঠে বলে—তুই তো এই-ই চেয়েছিলি।

—তোর কি আপত্তি আছে?—স্নিগ্ধ খুশীতে হাসে শৈলেন।

এই অতিরিক্ত খুশীটুকুতে প্রদ্যুম্নর মনে যেন চিড় ধরায়। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—না।

আকস্মিক স্তব্ধতা নেমে আসে শৈলেনের চোখে মুখে।

এই একটি কথার মধ্যেই যেন আলো-আঁধারের ব্যঞ্জনা। অনুভূতির এক বিকেন্দ্রিত তরঙ্গ। তা ছাড়া যেন অন্য অর্থ নেই। শৈলেনের চোখে প্রদ্যুম্নর গাম্ভীর্যের কুণ্ঠিত সংশয়। এগোতেও পারে না, পিছু হটতেও পারে না। যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই দৃষ্টির রহস্যের ভেতর দিয়ে শৈলেনের অতল অন্তর পর্যন্ত যেন এক স্বচ্ছ পথ চলে যায়। তার শেষ সীমানাটা শুধু দেখা যায় না।

দুজনের কথাই যেন ফুরিয়ে যায়।

শৈলেন ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের চাঁদ দেখে।

আগস্ট-বিপ্লবের কোনো ছায়া পার্বতীপুরে পৌছায় নি। এখানকার জীবন বিবর্ণ। গঞ্জ, মাড়োয়ারীদের পাটের গুদাম আর স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে লোকো-শেড। শহরটা রেলকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু অভিনব চাঞ্চল্য এসেছে পার্বতীপুরের জীবনে। লোভী মানুষ হানা দিচ্ছে ১৫২নম্বর সাব এরিয়া হেড কোয়ার্টার্সের আশেপাশে। মিলিটারি কনট্রাক্টের

কল্যাণে রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন। স্টেশনের আনাচে-কানাচে ফিসফিস। বুড়ী ছোঁয়ার আড়কাঠি খুঁজছে। কারো কোমরে ভেট দেবার নোটের বাণ্ডিল। কারো পকেটে হুইস্কির বোতল।

শহরে বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা। গুজবের ছড়াছড়ি। যুদ্ধের গুজব নয়, ঠিকেদারীর। ইমারত থেকে কড়াই-মুড়ি পর্যন্ত। দিশেহারা হয়ে উঠেছে মানুষ। একটু কিছু ধরতে পারলেই ভাগ্যের মরুভূমিতে কল্পতরু। এ জীবন কেন, দু-এক পুরুষ পা নাচিয়ে কেটে যাবে।

বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অতীত-ভবিষ্যতের দিকে মানুষের লক্ষ্য নেই। এক অতি বাস্তব পরিবেশের মধ্যে রৌপ্য ও রূপের আরাধনা শুরু হয়েছে। প্রথমটার নেশা টেনে এনেছে পেছনেরটাকে। রংপুর শিলিগুড়ি থেকে লালাজী এবং বাবুসাহেবরা ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গি মেয়েদের আমদানি করছেন মিলিটারি সাহেবদের নেকনজরের জন্য।

পার্বতীপুর স্টেশনে দাঁড়ালেই যুদ্ধের অনুভূতি পাওয়া যায়। কাটিহার ও নৈহাটি হয়ে উত্তর-ভারত থেকে আসছে ফৌজ ও সমরসম্ভার। সাইডিংয়ে মিলিটারি ওয়াগন কিংবা ট্রুপ স্পেশাল দু-একখানা লেগেই আছে। ট্যাঙ্ক, ভারি কামান, আর্মার্ড কার, এরোপ্লেনের পাখা-প্রোপেলার এমন কোনো বস্তু নেই যা বোঝাই নেই ট্রেনগুলোতে।

চীন থেকে আকাশপথে তেজপুরে উড়ে এসেছে কয়েক হাজার চীনে সৈন্য। রামগড়ে তাঁবু পড়েছে তাদের। পার্বতীপুরের উপর দিয়েই গেল। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে বহু বর্ণ-জাতির সংমিশ্রণে তারাও একটি রঙ।

স্টেশনে দাঁড়ালে আরেকটা জিনিস চোখে পড়ে। কোথায় যেন অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। ফৌজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। ব্যবধান ঘৃণার, আর ভয়ের। শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ নাক-সিঁটকে ফৌজের ছায়া বাঁচিয়ে চলছেন। দেশের ছেলে ফ্রন্ট-লাইনে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিরোধ করতে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের একটিমাত্র লোকও স্মিত শুভেচ্ছায় তাদের বিদায় দিচ্ছে না। গর্ববোধ করছে না।

সাধারণ ফৌজের আশপাশেও একপাল লোক গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ের মতো ঘোরাফেরা করছে। ট্রুপ-ট্রেনের জোয়ানদের কাছে, চড়া দামে এটা-ওটা বিক্রী করে ঠকিয়ে পয়সা করছে।

রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে চাপা থাকছে পার্বতীপুর স্টেশনের আরেকটা রূপ। সাইডিংয়ে অপেক্ষমান স্পেশালের ধারে-কাছে ছায়া-ছায়া নরমূর্তির আনাগোনা। চোরাই রেশন এবং মিলিটারি বস্ত্র ইত্যাদির লেনদেন। কুৎসিত প্রলোভনের দালালি। আদিম আকাঙ্ক্ষার বাণিজ্য এবং প্রতারণা।

মোট কথা পার্বতীপুরের গুরুত্ব অসম্ভব বেড়ে গেছে। অগ্রগামী সেনাব্যূহ সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন। গুরু দায়িত্ব পড়েছে ১৫২ নম্বর সাব-এরিয়ার উপর। সরবরাহ লাইন চালু রাখার।

ম্যালেরিয়া, আমাশয় এবং যৌনব্যাধিতে আসাম আরাকান উভয় ফ্রন্টের মেডিক্যাল ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পর্যাপ্ত মেডিক্যাল ইউনিট নেই। ৪৮ নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অগ্রগামী দল তড়িৎবেগে ধুবড়ী ছুটে গেছে। ভার নিয়েছেন হ্যারিস। ক্যাপ্টেন থেকে মেজর।

একমাত্র আসাম সীমান্ত থেকেই বিনা কালক্ষেপে সাত হাজার রুগ্নকে ভারতের বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে পাঠাবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাদের স্থান পূরণ করতে চাই নূতন সৈন্য। স্পেশাল সিক-ট্রেনে একদিন অন্তর ছশো রোগী আসছে ধুবড়ী থেকে। এখানে গাড়ি বদল করে কলকাতা হয়ে চলে যাবে পশ্চিমে। আহারের ব্যবস্থা স্টেশন-সংলগ্ন রেলের মাঠে। বসেছে ওয়ে-সাইড মেসিং ইউনিট।

সিক-ট্রেনের তদারক করছেন মেজর অ্যাডামসন। প্রদ্যুম্ন তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগী। সঙ্কটাপন্ন রোগীদের নামিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে এখানকার হাসপাতালে। ডাক্তার-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। এসেছেন ক্যাপ্টেন মজুমদার। শঙ্করনের সিনিয়ার। হাসপাতালের তিনিই এখন অধিকর্তা।

প্রচুর কাজ। প্রচুর অবসর। সিক-ট্রেন যেদিন আসে, ছুটাছুটি করে প্রাণান্ত। মাঝখানের দিনটিতে এগারোটা পর্যন্ত অফিস। লাঞ্চের পর অ্যাডামসন অফিসে আসেন না।

ভরা আশ্বিনের আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। বজ্রবিদ্যুতে আসন্ন ধারাবর্ষণের সংকেত। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। বাতাস নেই। দুঃসহ গুমোট। বর্ষাতির ভেতর ঘামে আধ-সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। তৃতীয় সিক-স্পেশাল দুঘণ্টা লেট। এসে পৌছাল এগারোটায়। তার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল। মেসিং ইউনিটের খাদ্য-

সন্তার উঠে এসেছে প্ল্যাটফরমের যাত্রী-শেডে। তাতেও সমস্ত ভিজে একাকার। রোগীরা বসে রইলো গাড়ির কামরায়।

বর্ষাতি নিয়ে বেরোয় নি প্রদ্যুম্ন। ভিজে চুপসে গেল। ঝঞ্ঝাট মিটাতে বেলা গড়িয়ে গেল একটায়। তখনও নিজের আহার হয় নি।

তাঁবুতে ফিরছে। হেঁটে নয়, ছুটে। পথে অনাথবন্ধু চৌধুরীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। ছাতার নীচে গুটিগুটি বাড়ি ফিরছেন চৌধুরীমশাই। ডাকলেন। আপত্তি সত্ত্বেও মাথার উপর বাড়িয়ে দিলেন ছাতাটা।

—খাওয়া হয় নি?

—এইবার হবে।

—মিলিটারী লাইফ বড্ড হেজার্ডাস—

—সেটাই তো স্বাভাবিক।—হাসির চেষ্টা করে প্রদ্যুম্ন।

—তা মশাই, এখন আমিও মিলিটারি। কাল পোশাক দেবে। নামটা লেখাতেই হল। কাচ্চা-বাচ্চার সংসার—বোঝেন তো।

কিছুটা রাস্তা এসে প্রদ্যুম্নকে বাঁ-হাতি ঘুরে যেতে হবে। চৌধুরীমশাই আপত্তি তোলেন।

—চলুন, আহারটা আজ আমার ওখানেই হয়ে যাক।

আপত্তি শোনেন না। হাত ধরে ফেলেন। কিছুতেই এড়াতে পারে না প্রদ্যুম্ন।

কোয়ার্টারের সামনে উভয়ে এসে দাঁড়ান। ভিতরে সেতারে ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। অনাথবাবু কড়া নাড়েন।

—আমার বড় মেয়েটা বদ্ধ পাগল। সময় নেই অসময় নেই, সেতার নিয়েই আছে।

—ছায়ানট সুন্দর তুলেছে!

গর্বের ছটা খেলে যায় অনাথবাবুর মুখে।

তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দোর খুলে দেয়। প্রদ্যুম্ন অনুমান করে ইনিই সেতার-বাদিনী। ভিতরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় মহিলা। শরীরটা বয়সের আন্দাজে বেশী ভেঙেছে। অনাথবাবু পরিচয় করিয়ে দেন।

—আরে, লজ্জা করছ কেন! ইনিই তো বোসবাবু।

প্রদ্যুম্ন নমস্কার করে। প্রতিনমস্কার করেন চৌধুরীগৃহিনী।

—ভদ্রলোক ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে—একখানা শুকনো কাপড় দে, কণা।

মেয়েটির নাম রূপকণা।

আলনা থেকে একখানা কাপড় এগিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে যায়। ঘরের এক কোণে বাস পরিবর্তন করে নেয় প্রদ্যুম্ন। ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে তক্তপোশের উপর বসে।

—শৈলেনবাবু এলেন না?—চৌধুরী-গৃহিণী প্রশ্ন করেন।

প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারে শৈলেন প্রত্যাশিত। তার আসা আকস্মিক।

চট করে কৈফিয়ত দাঁড় করান অনাথবাবু।

—যা বৃষ্টি, যেতে পারলুম কই। এঁকে তো ধরে এনেছি রাস্তা থেকে।

পাছে গৃহিণী আবার কোনো প্রশ্ন করেন, তাই খানিকটা ভূমিকাও যোগ করেন।—বুঝলেন, একটা পাকা রুইমাছ দিয়েছে একজন খালাসী। কথা ছিল, আপনাদের দুজনকেই বলব। তা এমনই বিদ্‌ঘুটে চাকরী, গোলমাল বেরুল তো সব ক'টা বগিতেই গোলমাল। অথচ দায়িত্ব প্রচুর। অ্যাকসিডেণ্ট হলে রক্ষে নেই।

—সে তো নিশ্চয়।

—এই তো দেখুন রেকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চেক করব, তবে যাবে আপনাদের মিলিটারি স্পেশাল। একটা লোককে খাবার সময়টুকু দিবি তো? কোম্পানীর এসব চিন্তার বালাই নেই। দু মিনিট লেট হলে ডি.টি.এস. পর্যন্ত গিলে খেতে আসবে।

[illegible]তে রূপকণা এ ঘরেই খাবার ঠাঁই করে দেয়।

আহারের পর বৃষ্টি আরও চেপে আসে। অনাথবাবুর ডি.টি.এসের ভয়। বর্ষাতি আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়তি ছাতা নেই। বাধ্য হয়েই প্রদ্যুম্নকে থেকে যেতে হয়।

এ ঘরে একটিমাত্র সিঙ্গল তক্তপোশ। সম্ভবত অনাথবাবু রাত্রে ঘুমোন। প্রদ্যুম্ন আগে থাকতেই তা দখল করে বসেছে। দেয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসেন অনাথবাবুর স্ত্রী।

পারিবারিক অনুসন্ধানের ভেতর দিয়েই প্রাথমিক আলাপ শুরু করেন চৌধুরী-গৃহিণী। অচিরেই নিজের মেয়ের প্রসঙ্গে আসেন এবং আর পাঁচজন মায়ের মতো

প্রশস্তি গাইতেও ত্রুটি করেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করতে মেয়েকে এ ঘরে ডেকে সেতার নিয়ে বসান।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। ঘরে সেতারের গাঁটের উপর রূপকণার আঙুল খেলা করছে। নিবিড় তন্ময়তায় ডুবে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিকতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে প্রত্যুম্ন।

কোনো উপন্যাসের রূপবতী নায়িকা নয়। সাধারণ গেরস্থঘরের আটপৌরে একটি মেয়ে। অপূর্ব স্নিগ্ধতা চোখ দুটিতে। ট্রেনের কামরায় চকিতে দেখা যে দু-একটি মুখ স্বপ্নের ছায়ায় মিলিয়ে যায়, তাদের শূন্য আসনে অনায়াসে বসানো যেতে পারে।

বাজনা শেষ করে রূপকণা মুখ তোলে। চোখে চোখ ঠেকে। অপ্রস্তুত বোধ করে দুজনেই। প্রত্যুম্ন বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ঘাসের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের তাঁবুগুলো।

সেতার তুলে ভিতরে চলে যায় রূপকণা।

ঘরের মৌনতা ভঙ্গ করেন চৌধুরী-গৃহিণী।

—শৈলেনবাবু আর আপনার এক জেলায় বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আগে থেকেই জানাশোনা?

—না, ফৌজে এসে। ধরুন, মাস ছয়।

—তাদের গ্রামে নিশ্চয় গেছেন?

—না, তাও যাই নি। ওরা গ্রামে থাকে না। ওর বাবা বাড়ি থেকে মাইল দশ দূরে জমিদারি-কাছারিতে কাজ করেন, সেখানেই ওরা থাকে।

—ওদের নাকি বিস্তর জমি-জায়গা, খুব সচ্ছল অবস্থা। কাকাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় ফৌজে চলে এসেছে।

—ঠিক জানি না। শুনেছি একজন মাত্র কাকা। বিদেশে থাকেন, কালে-ভদ্রেও বাড়ি আসেন না!

গম্ভীর হন চৌধুরী-গৃহিণী। মিনিটখানেক কথা বলতে পারেন না। তারপর চেষ্টাকৃত হাসির প্রয়াসে বলেন—হয়ত কাকা হঠাৎ বাড়ি গেছেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মন-কষাকষি হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়।

প্রত্যুম্ন জবাব দেয় না। চৌধুরী-গৃহিণীর ছুচোখে গভীরতর সংশয়। বলেন —বাবা যেকালে বেঁচে আছেন, কাকার সঙ্গে ওর ঝগড়া করাই বা কেন?

—অপরের পারিবারিক ব্যাপার এত তলিয়ে কে জানতে যায় বলুন।

চৌধুরী-গৃহিণী যেন একটু বিব্রত বোধ করেন। বলেন—এমনিতেই বলছিলাম। তা ছাড়া শৈলেনবাবুর একটু ছেলেমানুষী বাই আছে। বয়স এত হলে কি হবে—

—বয়সটাও এমন কিছু বেশী নয়।

—পঁচিশ-ছাব্বিশ তো নিশ্চয় হবে।

—এত হয় নি—।

—নিশ্চয়ই হয়েছে—।

—আমি ওর ক'বছরের বড় সেদিন নিজেই হিসেব করছিল। ওর বাইশ।

—এত কম?—ম্লান কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। কোথায় যেন তাঁর খটকা বেধেছে। কেমন যেন অলস অন্যমনস্কতা।

বৃষ্টি ধরে আসে। প্রত্যুম্ন ওঠে।

অত্যন্ত শঙ্কিত মনে তাঁবুর দোরে এসে দাঁড়ায়। শৈলেন ও কেশবের এখন অফিসে থাকার কথা। কিন্তু যদি তাঁবুতে থাকে, এক ঝাঁক কৈফিয়ত আদায় করবে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাঝখানে টেনে আনবে একটি গোবেচারা মেয়েকে। শোভনতার সীমা অতিক্রম করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

ছুজনার কেউ নেই। পোশাক পরে ধুতিটা বিছানার নিচে লুকিয়ে ফেলে।

অনাথবাবুর গৃহ মনে যেন নূতন আমেজ এনেছে। এক স্নিগ্ধ অনুভূতি। অথচ শূন্যতায় উদ্বেলিত।

তাঁবুতে ভালো লাগে না। স্টেশনে আসে।

বর্ষা-বিধৌত প্ল্যাটফরম। রোদ ওঠে নি। সমস্ত আকাশ মেঘে ছায়া। সিক-স্পেশাল রেক থেকে লাইনে এসেছে। রোগীদের ঘোরাফেরা বন্ধ। কামরার ভেতর বসে আছে। যাত্রায় উন্মুখ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হুস্ হুস্ করে ছেড়ে গেল ট্রেনখানা।

অনাথবাবুকে কোথাও দেখা যায় না। হয়ত বাড়ি ফিরে গেছেন। কিংবা ঠুং-ঠাং করছেন ইয়ার্ডে। আর.টি.ও-র সার্জেন্ট পেজ শুভ সায়াহ্ন জানিয়ে চলে গেল। স্পেশাল চলে গেছে, এবার তার হাত-পা ঠাণ্ডা।

অ্যাডামসন আসেন নি। আসবেনও না। সিঁড়ির মুখে বসে বিড়ি ফুঁকছে পাহারাদার।

কেল্‌নারের ঘড়িতে চারটে বাজছে।

চা খেতে খেতে মনে হয়, ইচ্ছে করলেই অনাথবাবুর গৃহ থেকে ঘুরে আসতে পারে। কুণ্ঠিত সংশয়কে নিজেই বোঝায়। ধার-করা জিনিস শীঘ্র ফেরত দেওয়াই ভব্যতা।

দোর খুলে একপাশে সরে দাঁড়ায় রূপকণা।

—ধুতিটা ফেরত দিতে এলাম।

ঘর নির্জন। চোখ তুলে তাকাতে পারে না রূপকণা। হাত বাড়িয়ে পাকানো ধুতিটা গ্রহণ করে।

প্রদ্যুম্নর হাতটাও কাঁপে। মনে হয় সমগ্র চেতনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক জায়গায় স্পন্দিত হচ্ছে। নির্জনতাকে সেও যেন সহ্য করতে পারছে না। ভয় হচ্ছে। তবু মন বাঙ্ময় হয়ে উঠছে। কিছু না বলে আসতে পারে না।

—আপনার বাজনা তখন চমৎকার লেগেছে।

রূপকণার মুখে লালিমা আসে।

—কেউ পছন্দ করেন না—

—কেন, আপনার হাত বেশ মিঠে—

দরজা খোলার শব্দে চৌধুরী-গৃহিণী ততক্ষণে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। মেয়ের প্রশংসার ঔজ্জ্বল্য মুখে লাগে।

—ভেতরে আসুন না—স্বাগত করেন।

নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে প্রদ্যুম্ন।

প্রদ্যুম্ন তখুনি চলে আসতে পারে না। গৃহস্বামিনীর সঙ্গে গল্প করে যখন সে বিদায় নেয়, বর্ষণশেষের পড়ন্ত রোদ্দুরে মাঠ-রাস্তায় আলোর প্লাবন। শরতের শান্ত নীলিম আকাশে কয়েক টুকরো সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। কোয়ার্টারগুলোর শেষপ্রান্তে নালার ধারে একগুচ্ছ কাশের ফুলে বাতাসের হিল্লোল।

অব্যক্ত খুশীর আলোয় প্রদ্যুম্নর মনের আকাশও ঝলমল করে। তাঁবুর একঘেয়ে পরিবেশে, সেপাই-ফলোয়ারদের তর্ক-কোলাহলের মাঝখানে এই

প্রসন্নতাটুকু নিমেষে খোওয়াতে সে চায় না। নালার পাশ দিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন এগিয়ে যায়।

তাঁবুতে ফেরে রাত নটায়। কেশব একখানা আর্মি-ডাইজেস্ট নিয়ে শুয়ে আছে।

এতক্ষণে প্রাণ পায় কেশব। আর্মি-ডাইজেস্ট বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে।

—ছিল একা ওসমান খাঁ, জয়সিংহেরও আবির্ভাব হল এবার। ডুয়েল চলুক ভাই, আর আমি শূন্য তাঁবুতে বসে আকাশের তারা গুনি।

প্রদ্যুম্নর দুর্বল মন খোঁচাটা বুঝতে ভুল করে না। শ্লেষের কণ্ঠে জবাব দেয়—এ কি জ্যোতিষশাস্ত্র হচ্ছে কেশব!

—জ্যোতিষ নয়, নামতা। দুয়ে দুয়ে চার—

—বকিস নে—

—চটছিস কেন? সমস্তটা বিকেল কোন মনোরম গুহায় ছিলি সেটা আমাদের জানতে বাকী নেই।

—জেনেছিস, বেশ করেছিস। তাহলে যত খুশি বকে যা।

—শৈলেন বলেছে রাজকন্যে তার সঙ্গে এনগেজড। এবার তুই কি বলবি বল।

প্রদ্যুম্ন চমক খায়। কেশবকে শৈলেন এতটা বলেছে, অথচ দুজনেই আমূল চেপে গেছে তার কাছে। তবু সে মুখে হাসি টেনে আনে। বলে—শৈলেনের সৌভাগ্যই সত্য হোক।

—খুব যে বিড়াল-তপস্বী!

—তাহলে তাই।

—দেখ, মিলিটারি ইজ মিলিটারি, প্রেম-অনুরাগ এখানে সইবে না। তার চেয়ে সন্ধ্যার পর থেকে তাঁবুতে বসে তাস পেটা, দিব্যি সময় কেটে যাবে।

শৈলেন ফেরে কয়েক মিনিট বাদে। বেশ গম্ভীর। শার্টটা তাঁবুর দড়িতে ছুঁড়ে ফেলে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবে। তারপর প্রদ্যুম্নর সম্মুখে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

—দুপুরে কোথায় খেয়েছিস?

—তুই নিশ্চয় জানিস।

—তা জানি। সেখানে কি কি বলে এসেছিস তাও জানি।

—কোনো অন্যায় বলেছি বলে তো মনে পড়ে না।

—ন্যাকার অনেক বিপদ। সে ভাবে সংসারটা বোকা, কেবল সে-ই চালাক।

—চালাক লোকেরাই নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে বলে বেড়ায়, না রে শৈলেন ?

—তেমন চালাক তুই নিজেও।

বাধা দেয় কেশব।—পার্সোন্যাল অ্যাটাক হচ্ছে। এবার ঝগড়া বাধবে। চুপ করে যা দুজনেই।

—চুপ করে তো যেতেই হবে। ইতরের সঙ্গে ইতরামো করবে কে ?

প্রদ্যুম্ন উত্তেজিত হয়ে উঠে, বলে—শুনলি কেশব—।

—ইতরকে ইতর বলেছি, শুনবে কি।

—আই সে, শাট আপ, শৈলেন।—উত্তেজনায় প্রদ্যুম্ন উঠে দাঁড়ায়।

—ভয় দেখাচ্ছিস নাকি ? বাঁদরামো করে বিশেষ সুবিধে হবে না, জেনে রাখিস।—জবাবের অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে যায় শৈলেন।

ব্যর্থ ক্ষোভে প্রদ্যুম্নর নিশ্বাস জোরে বইতে থাকে।

১৫২ নম্বর লাইন অব কম্যুনিকেশান-সাব-এরিয়া পার্বতীপুর থেকে চলে গেল। যাচ্ছে ঢাকা। সংবাদটি গোপনীয়।

গেল না কেবল মেডিক্যাল ব্রাঞ্চ। অর্থাৎ মেজর অ্যাডামসন আর জন তিনেক চাপরাসী। সিক-স্পেশালগুলোর বিলি-ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অ্যাডামসন হয়ত এখানেই থেকে যাবেন।

ঠিকেদারীর উমাদারদের আসা-যাওয়া স্তিমিত। কেল্‌নারে ভিড় নেই। রংপুর শিলিগুড়ি থেকে মেম-সাহেবরা আর বিকেলের গাড়িতে আসেন না।

ঠিকেদার আসে না, কিন্তু একজন লোক সন্ধ্যার পর স্টেশনে ঘোরাফেরা করে। পুরোনো বাজারের পাটগুদামের মালিক ধুনিচাঁদ অগ্রওয়াল। ওয়াগনের প্রচণ্ড অভাব। প্রায়োরিটিতে নাম লিখিয়ে ওয়াগন পাওয়া দুর্ঘটনার মতো ব্যাপার; ব্যবসায়ের দোর বন্ধ হবার অবস্থা। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ধুনিচাঁদ। এ.টি.এস-কে ধরেও হিল্লে হয় নি। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে পথের সন্ধান

দিয়েছেন বড় স্টেশনমাস্টার। প্রথমে এসেছিল প্রত্যুম্নর কাছে। হতাশ হয়েও হাল ছাড়ে নি। পেজের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মিলিটারি স্পেশালের প্রয়োজনে যে পরিমাণ ওয়াগন রিকুইজিশান করা হবে তার থেকে সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচখানা ওয়াগন প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে শেষ মুহূর্তে প্রত্যর্পণ করা হবে স্টেশন-মাস্টারের অনুকূলে। বাকীটা তার হাতযশ।

প্রতি সন্ধ্যায় সার্জেণ্ট পেজ কেল্‌নারে আসর জাঁকিয়ে বসে। তরুণীর উষ্ণ সান্নিধ্যের লালসা তার নেই। একলা বসে মদ খায়। পরিচিত সঙ্গী পেলে বহুৎ আচ্ছা। রাত সাতটায় অফিসের কাজ সেরে নিচে নামতেই সিঁড়ির মুখে প্রায়শঃ পেজের সঙ্গে প্রত্যুম্নর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। হয়ত সে অপেক্ষা করে। টেনে কেল্‌নারে নিয়ে আসে। স্পেশাল ডিশের অর্ডার পড়ে তারপর।

পেজের সঙ্গে কেল্‌নারে ঢুকলে ঘণ্টা দুয়ের আগে বেরুবার উপায় নেই। তিন-চার পেগ খাঁটি বিলিতি জিনিস পেটে না পড়লে পেজের ওঠবার মেজাজ হয় না। হ্যারিস একদিন মদ খাইয়েছিলেন ওষুধের মাত্রায়। পেজের অনুরোধেও একদিন মদ খেয়েছিল প্রত্যুম্ন। পরিমাণ সম্বন্ধে সংযত হিসেব না রেখেই। কেল্‌নারের আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কেমন যেন ঝাপসা ঠেকছিল পেজের মুখখানা। যেন চেনা যায় না। স্টেশনে ছোটাছুটি করছে একপাল লোক। নাক চোখ মুখ ছায়া-লেপ্টে একাকার। অনেককেই সে চিনতে পারে নি। সমস্ত প্ল্যাটফরম জুড়ে লোকগুলো অকারণে লাফালাফি করছে। যা করছে তার কোনো অর্থ নেই। কতকগুলো বুড়ো লোকের ছেলেমানুষী পাগলামিতে পেয়েছে। ভীষণ হাসি পেয়েছিল তার। হঠাৎ হাসি বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল চারিদিকে অন্ধকার। জীবনটা একান্ত শূন্য। তার কেউ নেই। বেঁচে থাকা অর্থহীন। তখন ভীষণ কান্না পেয়েছিল। প্ল্যাটফরমের উপর বসে কাঁদতে শুরু করেছিল। কোমরে হাত দিয়ে একরকম জোর করে টেনে তাকে তাঁবুতে পৌছে দিয়েছিল পেজ। দু বালতি জল ঢেলে দিয়েছিল মাথায়। বিছানায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পেজ আর কোনোদিন মদ খেতে বলে নি।

নিজের মদ খাবার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে পেজ।

—তোমার পোষাবে না, বোস। আমরা হজম করতে পারি, আমাদের স্বার্থকতার পৌছায়। মদ খেলে আকাশের তারায় তারায় পৃথিবীটা অনেক বড়

হয়ে উঠে। আমার স্বপ্নের ঘর-বাড়ি তার মধ্যে খুঁজে পাই। বিছানায় শুয়ে সাত হাজার মাইল দূরে ফ্রিয়াঁসের সঙ্গেও অনর্গল কথা বলতে পারি।

পার্বতীপুরের বাহ্য অঙ্গেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রেল-ইনস্টিটিউটের দশ-শয্যার হাসপাতালের পরিবর্তে পঞ্চাশ বেডের স্থায়ী হাসপাতাল মঞ্জুর হয়েছে। হলদিবাড়ি লোকো-শেডের পাশে দ্রুতগতিতে ব্যারাক তৈরী হচ্ছে।

সবচেয়ে উৎকট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে পার্বতীপুরের একটি আই. পি. টেণ্টের জীবনে।

কেশবের আত্মদর্শন অত্যন্ত সরল। সৈনিক-জীবনকে সন্ন্যাসী-জীবনের মর্যাদা দিতে সে রাজী নয়। তার মতে সৈনিক-জীবন রিক্ততা ও বঞ্চনার। সমস্ত আশা-প্রত্যাশা নির্বাসন দিতে হবে। চোখ কান বুজে, অপমান নীরবে সহ্য করে, অবসর সময় তাস পিটিয়ে আয়ু থেকে এক একটা দিন মুছে ফেলতে হবে।

কেশবের জীবনবোধকেই সহজ বিশ্বাসে স্বীকার করে নিতে চায় প্রদ্যুম্ন। সমস্ত দিক থেকে এই যান্ত্রিক জীবনের ছককাটা পরিধির মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তব-যুক্তি আর জীবনের নিজস্ব আকৃতির মধ্যে অন্তহীন অসঙ্গতি। উন্মনা বেদনার শেষ নেই।

শৈলেনের গতিবিধি একান্ত রহস্যাবৃত। তার প্রাত্যহিক জীবন-সূচীতে আহার ও নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া তাঁবুর সঙ্গে আর কোনো সংযোগ নেই। সে গম্ভীর, উদাসীন, রুক্ষ। কথা প্রায় বলেই না। যদি-বা বলে, তা শুধু কেশবের সঙ্গে। সর্বতোভাবে পরিহার করে প্রদ্যুম্নকে।

ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে এগিয়ে গেছলো কেশব। শৈলেন গোঁ ধরে আছে। বন্ধুত্বের মর্যাদা যে রাখে নি, তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সে রাজী নয়। কিন্তু কেশবের প্রশ্নের জবাবে কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ সে উপস্থিত করতে পারে নি। কেশব তাই চটে গেছে।

শৈলেনকে প্রদ্যুম্নও সহ্য করতে পারে না। তার বিচারবুদ্ধির যুক্তি অতিক্রম করেও অচরিতার্থ জীবনের কল্পনা-বিলাসের পথ উন্মুক্ত রয়ে গেছে। রূপকণা সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। সংশয়—রূপকণার মন, অনাথবাবুর গৃহে শৈলেনের অবাধগতি, অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ, দেশকালের অন্তহীন জটিলতা। সমস্তগুলির মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় মনের মধ্যে ঈর্ষা খচখচ করে।

ভাগ্যে অলস কল্পনার অবকাশ খুব কম। অফিসে নিশ্বাস ফেলবার সময়

নেই। একদিকে সিক-স্পেশাল, অন্যদিকে নতুন হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম, আসবাব, ঔষধ, স্টাফ। নির্মাণ-পরিকল্পনায় টুকিটাকি পরিবর্তন, চিকিৎসা-ব্যবস্থার সংগঠন সম্প্রসারণ, অসংখ্য চিঠিপত্র, রিটার্ন। রাত সাতটার আগে অফিস থেকে বেরুবার উপায় নেই। তারপরের অধ্যায়ে পেজ।

কেশব একা শুয়ে বই পড়ে। কিংবা মেসিং-ইউনিটের জমাদার সাহেবের তাঁবুতে টোয়েন্টি-এইটের আসর জমায়।

অনাথবাবুর সাক্ষাৎ নেই। কোথায় যেন তলিয়ে গেছেন অনাথবাবু। গরজ করে খোঁজ নেবার সদিচ্ছা বা সময় কোনোটাই হয় নি।

অফিসের একজন সহকর্মীকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই খবর পাঠিয়েছেন অনাথবাবু। তিনি অসুস্থ।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত চিত্তে প্রত্যুম্ন সদরে কড়া নাড়ে।

চৌধুরী-গৃহিণী দোর খুলে দেন। নির্জীবের মতো বিছানায় শুয়ে আছেন অনাথবাবু। শিয়রে বসে হাতপাখায় বাতাস করছে রূপকণা।

—ঘুণাক্ষরেও অসুস্থ সংবাদ জানতে পাই নি।—কৈফিয়ত দিয়ে প্রত্যুম্ন ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান চৌধুরী-গৃহিণী।

—শৈলেনবাবু বলেন নি?

—হয়ত ভেবেছে, আমি খবর পেয়েছি।

—হয়ত ইচ্ছে করেই বলেন নি।—সকলকে তাক লাগিয়ে বলে ওঠে রূপকণা। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নীচু করে নেয়।

অনাথবাবুও অপ্রস্তুত বোধ করেন। স্নিগ্ধ শাসনের কণ্ঠে বলেন—অনুমানের উপর কারোকে দোষারোপ করতে নেই, কণা!

রূপকণা তেমনি মাথা নীচু করে রাখে। মুখের উপর অনুশোচনার চিহ্নমাত্র নেই। বরং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে চোখ দুটি উজ্জ্বল।

নিজের অপ্রীতিকর অবস্থা যেন অনুভব করে রূপকণা। উঠে ভিতরে চলে যায়।

—ছেলেমানুষী কথা বলে লজ্জায় পড়েছে। তাই পালালো।—মার্জনার হাসিতে বলেন চৌধুরী-গৃহিণী।

এই সামান্য ব্যাপারটা চাপা দিতেই অসুখের কাহিনী শুরু করেন অনাথবাবু।

—সেদিন আপনাকে বসিয়ে রেখে খেয়েই ছুটে গেলাম ইয়ার্ডে। খাটুনিও গেছে প্রচুর। সেইটাই হয়েছে বাড়াবাড়ি। পরদিন দুপুরবেলা খেয়ে উঠতেই বমি হয়ে গেল। পুরোনো কলিকের ব্যথাটা আবার ঠেলে উঠলো। সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা বোসবাবু, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

—বয়স হয়েছে, একটু সামলে চলাই কি ভালো নয়।

—এখন তা ভাবছি। তখন উপরওয়ালার মুখ-ঝামটার ভয়ে অস্থির। আমাদের জীবনের এই তো মূল্য মশাই। হয়ত শেষ হয়েই যেতাম। দৈবক্রমে এসে পড়েছিলেন শৈলেনবাবু, আপনাদের মজুমদার সাহেবকে ডেকে দেখালেন। দেবতার মতো মানুষ মজুমদার সাহেব। সেদিন পর পর দুটো ইনজেকশন দিলেন। এখনও দুবেলা দেখে যাচ্ছেন। ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

চৌধুরী-গৃহিণীর ঐকান্তিক উপরোধ সত্ত্বেও চা-পানে রাজী হয় না প্রদ্যুম্ন। পরদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই উঠে আসতে পারে।

পরদিন প্রদ্যুম্ন যায় না। কতকটা আত্মসংশয়ে। রূপকণার সেদিনের মন্তব্যকে শৈলেনের প্রতি বিরাগের আভাষ বলে প্রথমে সে মনে করেছিল। পরে ভেবে দেখেছে, তাকে সংবাদ দেওয়া শৈলেন এবং রূপকণা উভয়েই বাঞ্ছনীয় মনে করে নি। পরামর্শ করেই চেপে গেছে। এবং এই সহজ সত্যটাই একটু বাঁকা সুরে সে পরিবেশন করেছে। বিরুদ্ধযুক্তিও মনের কোনো সান্ত্বনা নয়। তবু দুর্নিবার আকর্ষণে ঐ বাড়িটা তাকে টানে। মাঝখানে আরও একটা দিন বাদ দিয়ে সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হয়।

ক্যাপ্টেন মজুমদার আগে থেকেই আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। উচ্ছিষ্ট কাপ-ডিশগুলো তখনও সামনে পড়ে আছে। কুণ্ঠিত ব্যস্ততায় চৌধুরী-গৃহিণী সেগুলো তুলে নিয়ে গেলেন। মেঝেতে মাদুরের উপর পড়ে আছে সেতারটা। হয়ত কয়েক মিনিট আগে বাজিয়ে শোনাচ্ছিল রূপকণা।

ফৌজে পদ-কৌলিন্যের অস্পৃশ্যতা। নিজের বিশেষ গৌরবে কাপ্টেন মজুমদার অতিরিক্ত আত্মসচেতন। একটু উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। আত্ম-কর্তৃত্ব প্রকাশে তৎপর হয়ে তাকে অপমান করে না বসেন, এই আশঙ্কায় প্রদ্যুম্ন কুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

দুচার মিনিটের অধিক তাকে বসতে হয় না।

ক্যাপ্টেন মজুমদার ওঠেন।

—যাবে বোস ?

কণ্ঠে আদেশ নেই। কিন্তু দৃষ্টিতে নির্দেশ।

প্রদ্যুম্ন উপেক্ষা করতে পারে না।

দিনের আলো ডুবে যাচ্ছে। রেলের পড়ো-জমিতে ছেলেরা খেলা করছে। নিঃশব্দে ক্যাপ্টেন মজুমদারকে অনুসরণ করে পাকা রাস্তায় আসে প্রদ্যুম্ন।

—তুমি রোজ এ বাড়িতে আস ?

—না। অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছি।

—শৈলেন রোজ আসে।

—হয়ত—

—হয়ত নয়। রোজ আসে। এঁরা আমার কাছে নালিশ করেছেন।

—কেন ?

—রোজ উৎপাত কে বরদাস্ত করে বল ?

—এঁরা মানা করলেই পারেন। জোর করে কেউ অপরের বাড়ি ঢুকতে পারে না।

—এঁরা সামাজিক মানুষ চক্ষুলজ্জায় অসৌজন্য প্রকাশ করতে পারেন না। ঘরে সোমত্ত মেয়ে। একটা ডাঁশা ছেলে রোজ কেন আসে, নিশ্চয় বোঝেন।

মনে কেমন খটকা লাগে। প্রদ্যুম্ন তবু চুপ করে থাকে।

ক্যাপ্টেন মজুমদার সিগারেট ধরান। আকাশে ধোঁয়া ছেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন—একজন সাধারণ নাগরিকের পারিবারিক জীবনে উপদ্রব সৃষ্টি করা যে কোনো সৈনিকের পক্ষে গুরুতর অপরাধ। এই সামান্য কথাটা তোমাদের মনে রাখা উচিত।

—আমি কি করব ? যদি বলেন, আমি আর আসব না।

—না তোমার কথা হচ্ছে না। শৈলেনের কথাই বলছি।

—এঁরা তাকে স্পষ্ট বুঝতে দেন নি কেন ?

—দিয়েছেন, আমি জানি। কোনো ফল হয় নি বলেই আমার কাছে অভিযোগ করেছেন। একটা বাঙালী ছেলের বিরুদ্ধে অফিসিয়াল অ্যাকসান নেওয়া কি খুব দুঃখের নয়। তাকে তুমি বুঝিয়ে বলো।

—আমার সঙ্গে কথা নেই।

—আশ্চর্য !—এক সঙ্গে থাক—

প্রদ্যুম্ন নিরব থাকে।

আরও কিছুটা দূর চৌমাথা। বাঁ-হাতি রাস্তাটা অফিসার মেসে গেছে। মোড়ে এসে ক্যাপ্টেন মজুমদার দাঁড়ান।

—হয়ত তোমরা আমাকে ভুল বুঝতে। তাই তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।

—কেশবকে বলবেন স্যার।

—কারোকে বলবার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনস্থ কোনো লোক অন্যায় করলে, তাকে শাস্তি দেবার অধিকার আমার আছে।

সদম্ভে পা ফেলে এগিয়ে যান ক্যাপ্টেন মজুমদার।

প্রদ্যুম্ন ভাবতে পারে নি, সেদিন রাত্রেই ক্যাপ্টেন মজুমদারের সঙ্গে শৈলেনের সাক্ষাৎ হবে।

পেজের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যখন সে ফেরে, রাত্রি প্রায় দশটা। লণ্ঠনের ঝাপসা আলোয় কেশব পেশেন্সের রঙ মিলাচ্ছে। চারপাইয়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শৈলেন। জামাটা ছাড়বারও সুযোগ পায় না প্রদ্যুম্ন। তড়াক করে শৈলেন উঠে বসে।

—তেমাথায় দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ দিয়েছিস মজুমদারকে ?

প্রশ্নের ঢঙে প্রদ্যুম্ন অপমান বোধ করে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—পরামর্শ দিতে হয় নি। তোমার সম্বন্ধেই অভিযোগ করছিলেন ক্যাপ্টেন মজুমদার।

—দুই হিংসুটেতে তাহলে প্রাণের কথা হচ্ছিল ?

—সভ্যভাবে যদি কথা না বলতে পারিস, বলিস নে।—রূঢ় হয়ে ওঠে প্রদ্যুম্নর কণ্ঠ।

একটা অপ্রীতিকর পরিণতির পূর্বাভাসে শঙ্কিত হয়ে ওঠে কেশব।

—চুপ কর না দুজনেই। কি হচ্ছে শুনি ?

—হচ্ছে অনেক। মজুমদার হুকুম দিয়েছে তার অনুমতি না নিয়ে আমি হাসপাতাল-এরিয়ার বাইরে যেতে পারব না।

—কেন ? তুই কি লাইন কয়েদ ?

—হুকুম মানতে হবে। কৈফিয়ত চাইবার কোনো অধিকার আমার নেই।

—হুকুমের উদ্দেশ্য ?

—উদ্দেশ্য মহৎ। একটা মেয়ের সর্বনাশ করবার ষড়যন্ত্র করেছে এই খেড়েটা।

প্রদ্যুম্নর কানে যেন কে আগুন ঢেলে দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে—ইতরামিরও শেষ আছে শৈলেন।

—সত্যিকথা নিশ্চয় বলব। একশ বার বলব।

—আমি বলছি, চুপ কর।

—কি করবি তুই? মারবি? মার না।

গায়ে হাত দেবার অধিকার ফৌজে নেই। সমস্ত অপমান ও ক্রোধ হজম করে অসহায়ের মতো বসে পড়ে প্রদ্যুম্ন।

—তাঁবুটাকে একটা নরককুণ্ড করে তুলেছিস দুজনে মিলে।

ছোট্ট মন্তব্য করে গম্ভীর মুখে নিজের চারপাইয়ে বসে থাকে কেশব।

পুজো আসছে। আকাশে বাতাসে ছুটির সুর। স্টেশন থেকে খুব কাছেই নতুন বাজারের বারোয়ারী তলায় পূজামণ্ডপ বাঁধা হচ্ছে। ফৌজে পুজো নেই, ছুটিও নেই। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চলছে। বিপুল পরিমাণ সমরোপকরণ ও সৈন্য ছুটে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ও আসাম সীমান্তে। স্পেশাল মালগাড়িতে সমরসম্ভার আসাম সীমান্তে নিয়ে যাচ্ছে আমেরিকানরা। যুদ্ধ নয়, যেন একদল হুজুগে ছেলে পিকনিকে বেরিয়েছে। উৎসব আনন্দ যুদ্ধের প্রয়োজনে সব বন্ধ। জীবনও স্বাভাবিক পথ থেকে সরে এসেছে। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক দাবী বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। সেই প্রত্যাশায় আসে সংঘাত। আকর্ষণ, বিকর্ষণ—ক্ষোভ। সহজ ছন্দ কেটে যায়। ছোট্ট অভিযোগগুলি বাসা বাধে।

অনেক ভেবেও এই অভিযোগের কোনো সদুত্তর পায় নি প্রদ্যুম্ন।

ক্যাপ্টেন মজুমদারের উপস্থিতিতে সেদিন এঁটো কাপডিশগুলি ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিয়ে গেলেন অনাথবন্ধু গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শিষ্টাচারের দিক ভেবে তাকে চা-পানের মৌখিক অনুরোধ জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি।

স্বাভাবিক ভাবে দেখলে ঘটনাটা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু অশান্ত মানসিক অবস্থায় ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারও ন্যায্যাতীত গুরুত্ব লাভ করে।

অনেক ভেবেও প্রদ্যুম্ন এ প্রশ্নের জট খুলতে পারে নি।

শৈলেনের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। শৈলেনের ওপর সে চটে আছে। অপরের অপরাধের প্রতিশোধ যেন তার ওপর তুলেছে শৈলেন। তার অমার্জিত ব্যবহার ক্ষমার্হ নয়।

অনাথবাবুর গৃহেও যায় নি। মজুমদার শৈলেনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, তার বিরুদ্ধেও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এরূপ অভিমান প্রদ্যুম্নর মনে কোন সূত্রে এসেছে, সে নিজেও ভেবে দেখে নি। তেমনি জেদও চেপেছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওখানে যাবে না।

কিন্তু সমস্ত জেদ-অভিমানের অতীতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। কল্পনায় বাসা বেধেছে। সেদিন ক্যাপ্টেন মজুমদারের সামনে মাদুরে সে বসেছিল। সেতারের আলাপ থেমে গেছে। প্রদ্যুম্ন ঘরে ঢুকতেই লজ্জিত ভাবে ভিতরে পালিয়ে গেল। ওখানে তার ওমন ভাবে বসা, মজুমদারের তুষ্টি সাধনে বাজানো, এই সমস্ত কারণে ঈর্ষাগত অভিমান মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মন ওদিকে যায় নি। তার চঞ্চল গতি রূপের তরঙ্গে যেন ঝলমল করে উঠেছিল। সেতারের চেয়েও মিষ্টি। প্রদ্যুম্নর ভাবনা তার থেকে এগিয়ে যেতে পারে নি। পিছিয়েও আসতে পারে নি।

তবু ওখানে সে যাবে না। অনাথবাবু কাজে যোগদান করেছেন। যাবার কোনো অজুহাতও নেই।

এক নৈরাশ্যের শূন্যতায় নিজের মধ্যেই ডুবে আছে প্রদ্যুম্ন। এখানে কিছু যেন ভালো নয়। ভালো লাগে না।

প্ল্যাটফরমের ওপর, ইয়ার্ডে, অনাথবাবুর চলাফেরা অনেক বার করে চোখে পড়ে। প্রদ্যুম্ন গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে যায় না। আশা করে তিনি ডেকে কথা বলবেন। সামনা-সামনি দেখাও হল একদিন। ইয়ার্ডে যাচ্ছেন।

বললেন—কাজ হয়ে গেল ?

—না, এমনি একটু বেরুলাম।

—দেখছেন, এই তো রোদ্দুর, ইয়ার্ডময় ঘুরে বেড়াতে হবে।

—শরীর তো এখনও সারে নি।

—কে শুনছে।

এগিয়ে গেলেন অনাথবাবু।

প্রদ্যুম্ন তাঁর কাছে আরও কিছু প্রত্যাশা করেছিল। সস্নেহ আন্তরিক দু-একটি কথা। রূপকণার দু-একটি প্রশংসা। তাঁদের বাড়ি যাবার ছোট্ট একটি আমন্ত্রণ।

লাইনে ফিরতেই চেপে ধরে কেশব।

—তুই বলতে চাস শৈলেনের বিরুদ্ধে মজুমদারের কাছে তুই কিছু লাগাস নি ?

—নিশ্চয় না।

—তাহলে শোন, অনাথবাবুও কিছু বলেন নি।

প্রদ্যুম্ন আশ্চর্য হয়।

—কে বললে ?

—অনাথবাবু নিজে। কেন যায় না শৈলেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—সত্যি বলছিস ?

—অনাথবাবু তো রোজ স্টেশনে আসেন। তোর অবিশ্বাস হয় জিজ্ঞেস করিস।

—তুই বিশ্বাস কর, আমি ওর বিরুদ্ধে কারো কাছে কিছু লাগাই নি।

—তাহলে কে লাগাবে ?

বাকী থাকেন ক্যাপ্টেন মজুমদার।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ঘরে স্ত্রী আছে। ছেলেমেয়ে আছে। অকারণে মিথ্যে কথা বলে শৈলেনকে শাসনের ভয় দেখাবেন, ঠিক এই ঘটনাও বিশ্বাস করার নয়।

প্রদ্যুম্নর মুখ কালো হয়ে ওঠে। কেশবের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে—আমি লাগাই নি। সন্দেহ থাকে, সামনা-সামনি ক্যাপ্টেন মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

—জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন।

—কেন ?

—তা জানি নে। বললাম অনাথবাবু এ রকম বলেছেন। কটমট করে আমার দিকে তাকালেন।—শৈলেনের ইচ্ছে হয় যাক না। কিন্তু আমার কাছে নালিশ এলে আমি কোনো দয়াই করব না।

প্রদ্যুম্ন উৎসাহিত হয়ে বলে—তাহলে ? আমার নামগন্ধ কোথায় পেলি।

—কথা এক জায়গা থেকে উঠেছেই। তার হদিশ—কিন্তু কে বলবে ?

অহেতুকী তর্কের জবাব দিতে প্রদ্যুম্নর ইচ্ছা করে না।

এক মিনিট চুপ করে থেকে কেশব হাসে। বলে—প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বড়ই কুটিল। তা না হলে তোকে সন্দেহ করবে কেন।

কেশবের শ্লেষে প্রদ্যুম্ন রেগে যায়। কণ্ঠে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে—এত সন্দেহবাই যাদের, বিয়ে করেও তারা শান্তিতে সংসার করতে পারে না।

হো হো করে হেসে ওঠে কেশব।

প্রদ্যুম্ন গম্ভীর হয়ে থাকে।

পার্বতীপুরের জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। শৈলেনের সঙ্গে অনেকদিন প্রদ্যুম্নর কথা বন্ধ। এমন এখন মুখ দেখতেও ঘৃণা হয়। বেশীর ভাগ সময় জমাদার সাহেবের তাঁবুতে তাস নিয়ে জমে থাকে কেশব। তাঁবুতে তার অবস্থাটাও ভালো নয়। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কার মন রেখে কার সঙ্গে কথা বলবে ভেবে না পেয়ে গম্ভীর হয়ে থাকে।

একটি তাঁবুর মধ্যে বাস করেও তিনটি লোক দিনের পর দিন অপরিচিত হয়ে উঠছে। প্রদ্যুম্ন দুপুরে স্টেশনেই আহার করে। তাঁবুতে ফেরে রাত দশটায়। খেয়ে ফেরে, নয়তো চাপা দেওয়া ঠাণ্ডা খাবার গিলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। রাতটা কেটে যায়।

আবার দিন আসে। কর্মব্যস্ত দিন। প্ল্যাটফরমে মানুষের আসা-যাওয়া। ইঞ্জিনের বাঁশী। গাড়ির চাকায় লাইনে আর্তনাদ।

দিনান্তে কেলনারের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসে যে দিনটা শেষ হয়ে গেল অন্যমনস্ক চিন্তায় তাই যেন উপভোগ করে।

পেজ তিন নম্বর পেগটা শেষ করে উঠে গেল।

সন্ধ্যার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘ কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভিজে হাওয়া বেশ মিষ্টি লাগছে। নতুন বাজারের পূজামণ্ডপ থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে।

ওভার ব্রীজের উপর এসে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্ন। স্টেশন ফাঁকা। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসতে ঢের দেরী। মেঘলা আকাশে জ্যোৎস্না স্বচ্ছ নয়। হলদি-বাড়ির লোকো শেডের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। ব্রীজের পূর্ব প্রান্ত থেকে নতুন বাজারের দোকানের সারি। আলোর মিছিল। মানুষেরও মিছিল।

আসছে যাচ্ছে। ফাঁকা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে লাইন পেরিয়ে। ওভার-ব্রিজের রেলিংয়ে বুকের ভর রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন। আজকের দিনের খুশী ও প্রেরণার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। যেন অনেক দূরে চলে এসেছে। সমাজ-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন। একা। সহজাত সংস্কার এবং অতীত জীবনের পারিপার্শ্বিকতার স্মৃতি মূল্যহীন। এই অনুভূতি তাকে পীড়া দেয়। স্তব্ধ বিপন্নতা সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বোস ?—নীচে থেকে ডাকে কেশব।

প্রদ্যুম্ন সাড়া দেয়।

—চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

—কি করব ?

ঘুরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে কেশব .

—এখানে দাঁড়িয়ে যাকে ভাবছিস, একটু এগিয়ে পূজো-মণ্ডপে গেলে তার দেখা পেতিস।

—কার কথা ভাবছি ?

—নে, সাধুগিরি রাখ। টানা-টানা চোখ, আটসাট শরীর, তা পালে হাওয়া লাগবার মতোই চেহারা।

প্রদ্যুম্ন নিজের অজান্তেই হেসে ফেলে। বলে—You too Brutus.

দু হাত জোড় করে নাটুকে ভঙ্গিতে কপালে ঠেকায় কেশব।

—পেন্নাম যাই ঠাকরুন। শৈলেন, তুই, আবার জুটেছে ক্যাপ্টেন মজুমদার। সে আবার শ্রীমতীকে পূজো দেখতে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আর কারোকে দেখলাম না। ওই race-এ ছোটা আমার মতো আনাড়ি ঘোড়ার কম্মো নয়।

কেশবের মন্তব্যে রূপকণার প্রতি যে রূঢ়তা আছে, প্রদ্যুম্নকে তা আহত করে।

কেশবের দু পাটী দাঁত সরস হাসিতে বিকশিত। প্রদ্যুম্নকে জবাব দেবার সুযোগ দেয় না।

বলে—নাটক বেশ জমে উঠেছে। শৈলেন হয়ত সন্ধ্যা থেকে বাড়ি আগলে বসে আছে। আরেকজন হতাশ প্রেমিক ব্রীজে চড়ে আকাশের তারা গুনছে। আর মায়াবিনী রাজকন্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে বুড়ো যাদুকরের সঙ্গে। —হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শব্দান্বিত হয়ে উঠে কেশবের হাসি। এই হাসিতে প্রদ্যুম্ন যোগ দিতে পারে না। বরং সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

বলে—পরচর্চা করতে খুব ভালো লাগে—না?

—বাঙালীর স্বভাব যে। তা ছাড়া বিষয়বস্তুটা কত রসালো।

কেশব যাতে থেমে যায় এই উদ্দেশ্যে প্রদ্যুম্ন জবাব দেয় না।

এক মিনিট নিঃশব্দ থেকে প্রদ্যুম্নর কাঁধের উপর হাত রাখে কেশব।

—এই নেশা ছেড়ে দে। অনাথবাবুরা আলাদা টাইপ। প্যাণ্ডেলের পাশে চায়ের দোকানে বসে পাড়ার ছেলেগুলো কি বিশ্রী আলোচনা করছে। তাদের কথা থেকেই তো বুঝতে পারলাম, ওই তোদের রূপকন্যা, না রাজকন্যা।

—থাক শুনতে চাই নে।

—কেন, মন খারাপ করছে?

—না।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে কেশব। এক পা এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—আমার বুকে হাত দিয়ে বল।

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায় প্রদ্যুম্নর মুখ। বুক কেঁপে উঠে।

তবু বলে—না।

কেশবের মুখ থেকে খুশীর ঔজ্জ্বল্য নিভে যায়।

—তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিস।

ঘাড় ফিরিয়ে দূরে উজ্জ্বল তারাটার দিকে চেয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন। অনুভব করে, উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেশব। জবাব চায়।

জবাব যেন পৃথিবী আর তারাটার মধ্যে যে অন্ধকারের বিস্তৃতি তার অতলে ডুবে আছে। স্থির নয়। দুদিকেই হেলছে।

স্পষ্ট নয়। তবু উজ্জ্বলতা।

কিছুক্ষণ চুপ করে কাটিয়ে নিজেকে গুটিয়ে আনে প্রদ্যুম্ন। মুখ খোলে।

—জীবনে অনেকবার এরকম ঘটে কেশব। কারোকে দেখে মনে হয়, একে ভালোবাসতে পারি। মনে হয়, একে না পেলে সমস্ত জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু সে আশা কি বাস্তবে পূর্ণ হয়? তাদেরও আমরা একদিন ভুলে যাই। মনের চাওয়ার একটা পথ, যুক্তির আরেকটা পথ। দ্বন্দ্ব চিরকাল থাকবেই।

ছুটি গভীর চোখ তুলে কেশব তাকায়। শান্ত কণ্ঠে বলে—সত্যি করে বল কি চাস তুই ?

—জানি না। হয়ত কিছুই চাই না।

চুপ করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে কেশব।

বলে—চল লাইনে যাই।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে দুজনে।

নতুন বাজারে পুজোর বাজনা থেমে গেছে। তের নম্বর সিক স্পেশ্যালও চলে গেল।

পার্বতীপুরের ছোট্ট শহর আদিগঞ্জ থেকে মাইল-টাক দূরে। রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন বসতি। নতুন বাজার। উভয় অংশ নিয়ে হাজার দেড় হাজার বাস্ত। লোকসংখ্যা আট হাজারেরও কম। বাজারের মাঝখানে নিবারণ আঢ্যর সাইনবোর্ড-হীন চায়ের দোকান। চেহারাটা স্থান নির্বিশেষে ভদ্র। শহরের সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনার বিনিময় কেন্দ্র। ওখান থেকেই শুনে আসে কেশব। রূপকণাকে নিয়ে গুজব পল্লবিত হচ্ছে। মেয়েটাকে দিয়ে মিলিটারির কাছ থেকে দুপয়সা ঝেঁকে নিচ্ছেন অনাথবাবু।

এই কুৎসিত সন্দেহের প্রতিবাদ না করে পারে না প্রদ্যুম্ন।—নন্‌সেন্স—

কেশব হাসে।

—তুই আমি না হয় কিছু জানি। কিন্তু খারাপ আলোচনা মিথ্যে হলেও, শুনতে ভালো।

—মিলিটারি বলতে আমি, শৈলেন আর মজুমদার। তিনজনেই তাহলে অপরাধী।

—মূল অপরাধী মনে হল একজন। কিছু একটা ঘটেছে। আমাকে দেখে এমন ইশারা ইঙ্গিতে কথা বললে, কিছু বুঝতে পারলুম না।

—সেই ঘটনাটাও মিথ্যে।

—কি হয়েছে তুই জানিস ?

—আমি না জানলেও, শৈলেন নিশ্চয় জানতে পারতো।

—শৈলেনকে জিজ্ঞেস করবে কে ? ও বাড়ির নিন্দে শুনে তেড়ে মেরে বসুক আর কি!

অনুমানের উপর সেই অজ্ঞাত ঘটনা নিয়ে গবেষণা করতে রাজী হয় না

প্রদ্যুম্ন। তা ছাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরতে বলেছেন এ্যাডামসন। সে উঠে পড়ে।

লাঞ্চ খেয়ে এ্যাডামসন ফিরে এলেন দেড়টায়। ক্যাপ্টেন মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। সকাল থেকে কয়েকটা খালি প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে দরজার বাইরে। ঘরে এনে ওগুলোর ভিতর সমস্ত ফাইলপত্র গুছিয়ে তুলতে হল।

প্রদ্যুম্ন স্পষ্টই বুঝে নিলে, এখানকার পালা শেষ। এল, অব, সি, সাব-এরিয়ার শেষ প্রতিভূ গমনোন্মুখ।

হেড-কোয়ার্টারের অগ্রগামী অংশের সঙ্গে যোগদান করতে এ্যাডামসন রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন পরদিন সকাল আটটায়। শেষ সিক-স্পেশালের ভার নিচ্ছেন ক্যাপ্টেন মজুমদার। প্রদ্যুম্নরও পার্বতীপুরে থাকবার প্রয়োজনীয়তা নেই। হেড-কোয়ার্টারে ক্লারিক্যাল স্টাফ এসে গেছে। অতএব এ্যাডামসনের সঙ্গে যাবার প্রশ্নও নেই।

পাইপের নীলাভ ধূম শূন্যে উদ্গারণ করলেন এ্যাডামসন্।

—তুমি কোথায় যাবে? ব্যারাকপুর, না ফিল্ড সার্ভিস?

ফিল্ড সার্ভিস মানে হাসপাতাল জাহাজ। সমুদ্রে নয়। বাংলা দেশেরই কোনো এক প্রান্তে। অনেক পীড়াপীড়িতে নাম বললেন, দাউদকান্দি।

নামটা কখনও শোনে নি। দ্বিধায় পড়ে প্রদ্যুম্ন।

এ্যাডামসন হাসেন।

—তোমাকে পনের মিনিট সময় দিলাম। নীচে চা খেয়ে, মনঃস্থির করে এসো।

কেলনারের দোকানে বসে দুমিনিটও ভাবতে হল না।

পার্বতীপুরের জীবনে ক্লান্তি এসেছে। ভালো না-লাগার অসহিষ্ণুতা। কেউ তাকে চায় না। মানুষের অকারণ সন্দেহে এক কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। ছুটে পালাতে পেলে যেন বাঁচে। কিন্তু কোথায়?—

অনেক দূরে। যেখানে কেউ তাকে চেনে না। কোনো নির্জনতায়। দাউদকান্দি!—যত দূরেই হোক।

এ্যাডামসন বললেন, সে একা নয়। সঙ্গে যাবে আরও দশজন। সিক-ট্রেনে যারা কাজ করেছে। হাসপাতালের স্টাফ হলেও বাধা নেই। সে বাছাই করে নিতে পারে। রাত্তিরেই রওয়ানা হতে হবে। এখন একটা দিনও মূল্যবান। অকারণে নষ্ট করা অন্যায়।

অফিস থেকে বেরোয় প্রদ্যুম্ন।

তিনটা বাজতে চলেছে।

স্টেশন-ঘরের বারান্দা পার হয়ে দ্রুত এগিয়ে যায় প্রদ্যুম্ন। অন্যমনস্ক। ট্রেন একজামিনারদের ছোট কুঠুরীতে বসে ছিলেন অনাথবাবু। খেয়াল করেন নি। দোরে এগিয়ে এসে তাকে পিছু ডাকলেন।

—হন্তদন্ত হয়ে চললেন কোথায় বোসবাবু?—

—লাইনে।

এগিয়ে এলেন অনাথবাবু।

—চলুন। আমিও যাব। এখন ট্রেন নেই। এই ফাঁকে চা খেয়ে আসি।—অনাথবাবু হাসেন।

প্রদ্যুম্নর গা জ্বলে যায়। লোকটাকে পরিহার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে না। চলে যাবার দিনটিতে কারো প্রতি সে রূঢ় হতে চায় না। উদারতায় সবাইকে ক্ষমা করতে চায়।

অনাথবাবু বিনয়ের কণ্ঠে ব'লেন—আশ্চর্য লোক আপনি। সেই কবে আমাদের বাড়ি গেছলেন, তারপর এতদিনের মধ্যে আর দেখা নেই।

—কেন আপনার সঙ্গে তো প্ল্যাটফরমে অনেকবার দেখা হয়েছে।

—এ রকম দেখা হওয়া আর বাড়ি যাওয়া ঢের তফাৎ। বুঝতেই তো পারেন; আমাদের চাকরিতে কি পরিমাণ দুর্ভাবনা। কোনটি হল, কি বাকী রইলো, কিসের জন্য কৈফিয়ৎ তলব হবে।—কারো সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে দুমিনিট সুস্থিরভাবে আলাপ করব সে উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন মামুলি কৈফিয়তের সুরে বলে—ব্যস্ত থাকেন বলে আমিও ডাকি নে।

—বাড়িতেও দু-একদিন আপনার কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কি জানেন, ভুলে যাই। এত কাজ সামলানো যায় না। এই তো দেখুন পার্বতীপুরে ট্রেনের আসা-যাওয়া চারগুণ বেড়েছে। ইয়ার্ড খালি পড়ে থাকতো, এখন তিল ধারণের স্থান নেই। লোক কি বেড়েছে একটা দুটো। ভুগে ভুগে শরীরও অসমর্থ হয়ে পড়েছে। দম পাই নে। এ ভাবে খাটতে হলে ঠিক মরে যাবো।

অনাথবাবু সত্যি কৃশ হয়ে উঠেছেন। মুখে শ্রী নেই। স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুরতা। প্রদ্যুম্ন সমবেদনা অনুভব করে। বলে—লম্বা ছুটি নিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করুন।

—যাব। ছেলেটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তিনমাস ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে

বসবো। আমার জ্ঞাতি ছোট ভাই মাদারীপুরে নামকরা ডাক্তার। এম. বি। তার চিকিৎসায় থাকলে নিশ্চয় উপকার হবে।

—এখানে থেকেও চিকিৎসা করাতে পারেন। ক্যাপ্টেন মজুমদার ডাক্তার হিসাবে ভালো।

—নিন্দে করব না, আরেকবার আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ডাক্তার ভালোই। কিন্তু লোক বড় বাজে। ওর সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে চাইনে।

প্রদ্যুম্ন এই প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন করে না।

মিনিট খানেক চুপ থেকে অনাথবাবু বলেন—বয়স্ক লোক, কিন্তু কি বলবো। সেই সপ্তমী পূজার রাত্রে—ধরুন, কণা তার মেয়ের বয়সী—

কৌতূহল প্রদ্যুম্নকে অনাথবাবুর সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। হাসপাতালের গেট পার হয়ে যায়।

অনাথবাবু বলেন—কণাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেল। ভদ্রলোকের ছেলে, এতবড় দায়িত্বশীল অফিসার। নিজে থেকে বলেছে—আমাদের মনে কোনো কু-চিন্তা আসে নি। তবু সোমত্ত মেয়ে, ছেলেটাকেও সঙ্গে দিলাম। কিছুক্ষণবাদে ছেলে ফিরে এলো। বললে, কাপ্তান সাহেব পূজোর দিনে মুসলমান বাবুর্চির রান্না খাবেন না, রাত্রে এখানেই খাবেন। বেশ ভালো কথা, কিন্তু মেয়ে আর আসে না। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদে একলা ফিরে এসে সোজা চলে গেল ভেতরের ঘরে। মুখ দেখেই বুঝলুম কোনো কিছু ঘটেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, উনি কখন আসবেন। জবাব দিলে, আসবেন না।—এরপর আর কোনোদিন আসেন নি।

রহস্যটা আড়ালে রেখেই চুপ করে গেলেন অনাথবাবু।

প্রদ্যুম্ন কৌতূহল দমন করতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—কেন আসবেন না, কারণ কিছু বলে নি।

—তার মার কাছে বলেছে।—ইতস্ততঃ করেও বলে ফেলেন অনাথবাবু। ফিরবার পথে রিক্সায় জবরদস্তি করতে চেষ্টা করেছিল। কণা তো আমার তেমন মেয়ে নয়। রিক্সাওয়ালাকে ডেকে রিক্সা থামিয়ে হেঁটে চলে এসেছে।

—শহরে বোধহয় এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

—মেয়েটার এমনিতেই বিয়ে হচ্ছে না, জানি নে কপালে কি দুর্ভোগ আছে—একটু থেমে বলেন—শৈলেনকে বলবেন না। মজুমদার সাহেবের সঙ্গে এমনিতেই

শুনেছি সদ্ভাব নেই। এই নিয়ে আবার ঝগড়া ফ্যাসাদ বাধাবে। হাজার হোক মেয়ে তো। চারিদিকে আরও রটনা হবে।

অনেকটা রাস্তা চলে এসেছে। অনাথবাবুর ফটক ওখান থেকে দেখা যায়। তাড়া আছে বলে প্রদ্যুম্ন বিদায় চায়।

অনাথবাবু হেসে বলেন—তাড়া কি আমার নেই। রেলের চাকরি, টিকি ধরবার জন্য সাড়াশীওয়ালা ঢের। কিছু দেরী হবে না। চায়ের জল এতক্ষণে হয়ত ফুটছে। দোরে এসে চলে গেলে দুঃখিত হব।

অগত্যা প্রদ্যুম্নকে রাজী হতে হয়।

অনাথবাবু বিনয়ের কণ্ঠে বলেন—আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি নে বোসবাবু। শৈলেনকে যত সহজে বলতে পারি,—এসো। আপনাকে বলতে ভরসা পাই নে। কেমন যেন আলাদা আলাদা আপনি। নিজের খেয়ালমতো থাকতে ভালোবাসেন।

—দুদিনের বেশী কোথাও আমাদের থাকার ভাগ্য নেই। মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? এই তো আজকেই চলে যেতে হচ্ছে।

আশ্চর্য হয়ে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে যান অনাথবাবু।

—কবে ফিরবেন?

—ফিরব না, বদলী।

কয়েক মুহূর্ত অনাথবাবুর মুখ দিয়ে বাকস্ফূর্তি হয় না।

কড়া নাড়ার শব্দে দোর খুলে দেয় রূপকণা। মেঝেতে শুয়ে ছিলেন চৌধুরী-গৃহিণী। উঠে বসলেন।

বাড়ি এসেই প্রদ্যুম্নর চলে যাবার সংবাদ ঘোষণা করলেন অনাথবাবু। চৌধুরী গৃহিণী বিস্ময়ে বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন।

রূপকণার মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। চোখ দুটি যেন ছলছল করে উঠলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে গেল যেন সে।

—কারোকে ধরে করে বদলী রদ করানো যায় না?—প্রশ্ন করেন চৌধুরী-গৃহিণী।

অনাথবাবু সায় দেন।

—মেজর সাহেব তো আপনার হাতের মুঠোয়। তিনিই তো সবার মালিক। ইচ্ছে করলেই আপনার জায়গায় অন্য কারোকে পাঠাতে পারেন।

—আমিই যেতে চেয়েছি।

—আপনি নিজে ?—অনাথবাবু যেন বিস্ময়ের আরেকটা ধাক্কা খান।

—এখানে আপনার ভালো লাগে না ?—মাঝখান থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করে রূপকণা।

রূপকণার দুচোখে ঐকান্তিক আবেদন। তার ছোট্ট প্রশ্নটি সুরের মতো ঘরের বাতাসে যেন কেঁপে উঠে।

প্রত্যুম্নর নীরবতায় মেয়ের প্রশ্নের ঔচিত্য ভেবে অনাথবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলেন —চাকরি কি মা ভালো-লাগার জন্যে। মিলিটারির ব্যাপার, আজ না হয় কাল যেতেই হবে।

—এখনও তো মেজর সাহেবকে ধরে চেষ্টা করতে পারেন থাকার।—অনাথবাবুকেই যেন প্রশ্ন করে রূপকণা।

জবাবটা প্রত্যুম্ন দেয়।

—থাকা মানেই মজুমদার সাহেবের অধীনে কাজ করা। লোকটাকে বরদাস্ত করা কঠিন।

প্রত্যেকেই যেন নিরব থেকে প্রত্যুম্নর এই অনিচ্ছাকে সমর্থন জানায়।

ঘরের মধ্যে নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে।

চায়ের জল চাপিয়ে রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসে রূপকণা।

—কোথায় যাচ্ছেন, তাও বলছেন না। আমার ভয় হচ্ছে বাবা। ওঁকে বোধহয় যুদ্ধে পাঠাচ্ছে।

—না। তেমন কিছু নয়।—মুখে সহজ হাসি আনে প্রত্যুম্ন।

—তাহলে বলছেন না কেন ?

—প্রথমে আমাদের জানবার কথা নয়। জানলেও বলা গুরুতর অপরাধ। তবে এইটুকু জানি ফ্রণ্ট লাইনে আমাকে পাঠাচ্ছে না।

অনাথবাবু মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—ওঁকে যুদ্ধে পাঠাবে কিসের জন্য। উনি তো আর সোলজার নন। ওঁর কাজ অফিসে। যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে তো সব গর্ত খুঁড়ে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে থাকে। সেখানে কি অফিস-কাছারী বসে মা!

রূপকণা কতটা বিশ্বাস করেছে ঠিক বোঝা যায় না। মিনিট খানেক চুপ থেকে প্রশ্ন করে—আবার কবে এখানে আসবেন ?

—কে জানে?—হেঁয়ালীর কণ্ঠে জবাব দেয় প্রত্যুম্ন।

রাত্রে আহারের আমন্ত্রণ জানালেন চৌধুরী-গৃহিণী।

কিন্তু আটটায় ট্রেন। বেঁধে-ছেদে লোকজন নিয়ে তার আগেই স্টেশনে হাজিরা দিতে হবে। সবিনয়ে অক্ষমতা জানিয়ে অনেক কষ্টে রেহাই পায় প্রত্যুম্ন।

অনাথবাবুরও হাতে আর সময় নেই। স্টেশনে যেতে হবে। দুজনেই এক সঙ্গে ওঠে!

সেদিনের সেই তে-মাথায় এসে দাঁড়ান অনাথবাবু। কিছু যেন বলতে চান। অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে শেষ পর্যন্ত বলেও ফেলেন।

—রেলে চাকরি করি, কি আনি কি খাই, সবই বুঝতে পারেন। দেনা ছাড়া সঞ্চয় নেই।

—সে তো নিশ্চয়। যা দিনকাল পড়েছে।

উৎসাহ পান অনাথবাবু।

—বড় সমস্যায় পড়েছি বোসবাবু। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্রেজেডি ওই মেয়েটা। রূপগুণের কথা বাপ হয়ে বলতে নেই। প্রথম সন্তান। আমার স্নেহের উপর সব চেয়ে বেশী দাবী তার। অথচ আমার কোনোই সামর্থ্য নেই।

এ সমস্ত কেন বলছেন অনাথবাবু এবং প্রকৃতপক্ষে কি বলতে চান, প্রত্যুম্নর বুদ্ধিতে কিছুই স্পষ্ট হয় না। তবু কান দুটো তার গরম হয়ে উঠে। কুণ্ঠিত হয় সে।

নিঃশব্দে থাকা আরও বিসদৃশ।

—শৈলেনকে কি আপনাদের পছন্দ নয়?—অন্য কিছু ভেবে না পেয়ে বলে।

—শৈলেন বোধ হয় কণার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট।

থেমে বলেন,—বয়সটা অগ্রাহ্য করব, দুর্বল মুহূর্তে তাই কি না-ভেবেছি। কিন্তু কণার নিজেরও মত নেই। আজকাল ওর সামনেও আর বেরোয় না।

—বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেন নি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন অনাথবাবু।

—তেইশটা বছর আমার চোখে চোখে মানুষ। মুখ দেখলেই মনের কথা বুঝতে পারি। হয়ত বলবেন সব অনুমান ঠিক হয় না। কিন্তু আমি নিশ্চিত জেনেই বলছি।

প্রদ্যুম্নর পা দুটি যেন কাঁপে। মাটির উপর আরও চেপে দাঁড়ায় সে।

—শৈলেন আমার স্ত্রীকে কাকীমা বলে। ছেলেমানুষ। আমার কণার চেয়েও ছোট। স্নেহ চায়। মুখ ফিরানো যায় কি ?

—না, তাতে কি হয়েছে।

আবার মেয়ের প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন অনাথবাবু।

—কোনো হৃদয়বান ছেলে যদি অধমকে দায় মুক্ত করে। মেয়ের দিক থেকে আমি বলতে পারি, তার স্বামী কোনোদিন অসুখী হবে না।

—বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমি চেষ্টা করব।

অনাথবাবুর চোখ দুটি আরও একাগ্র হয়ে উঠে।

—আপনার উপর আমার কোনো দাবী চলে না। তবু—

কথাটা শেষ করতে পারেন না অনাথবাবু। মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। চোখ দুটি অসহায়। কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। কিছুই বলতে পারেন না।

—আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব।

আবার আশ্বাস দেয় প্রদ্যুম্ন। হাত তুলে নমস্কার করে। ধীরে ধীরে নিজের পথে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যায় যন্ত্রচালিতের মতো। সুমুখের পথটুকু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। অনাথবাবুর প্রতিটি উক্তির মধ্যে কোন ইঙ্গিত, কোন আভাস প্রচ্ছন্ন, তাই অনুধাবন করতে করতে তলিয়ে যায়।

অথচ নির্বিশেষে কোনোটাকেই নিশ্চিত বলে সে গ্রহণ করতে পারে না।

সংশয়ের পর সংশয়ের ঢেউ আসে।

নদী, নীল আর নির্জনতা।

দাউদকান্দির সদ্যনির্মিত সঙ্কীর্ণ জেটি নির্জন।

ঘাটনলের খালে কার্তিকের মরা জল শান্ত। হাজার-বারোশো পরিত্যক্ত নৌকায় জেটির উভয়দিকে সিকি মাইল অবধি খালের দু তীর আকীর্ণ। এত নৌকার একত্র সমাবেশ দেখলে আশ্চর্য লাগে।

ভারতরক্ষা আইনের তেরো নম্বর অর্ডিন্যান্স বলে নৌকাগুলো সরকার

বাজেয়াপ্ত করেছেন। জাপানী আক্রমণে পাছে শত্রুদের ব্যবহারে আসে। মালিকদের মালিকানা গেছে। এখন মালিক সরকার। থানার পাহারা।

জেটির ওপারেই রাস্তা অতিক্রম করে থানা। মিলিটারি ব্যবস্থায় ফোন বসেছে।

দাউদকান্দি—ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার সীমান্তে ছোট্ট গঞ্জ। হপ্তায় দুদিন হাট বসে। তা ছাড়া বাকী দিনগুলোতে মহাজনী দোকানে কেনাবেচা প্রায় নেই। তখন হয় মালিক-কর্মচারীদের মধ্যে কথার লেনদেন। তাসের আড্ডা। বেপারীদের শূন্য চালাগুলোয় ছায়ার আনাগোনা।

ভর দুপুরে গঞ্জের লোক নৌকার ভাঙা ছই, পাটাতনের কাঠ রান্নার জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পাহারাদার সেপাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-এক আনা সেলামি আদায় করে।

পার্বতীপুর থেকে কুমিল্লা। ১৫ নম্বর সি.সি.এস. (ক্যাজুয়্যালটি ক্লিয়ারিং সেক্শান)-এর আতিথ্যে কেটেছে দু রাত্রি। এক সূর্যধৌত সকালে লোকজনসহ দাউদকান্দি। মোটর-ট্রাকে বিয়াল্লিশ মাইল।

জেটির কোলে ভাসছে এস. এস. সুইফট। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ সার্ভিসের জয়েণ্ট কোম্পানীর স্টিমার। চিমনির দু পাশে শুভ্র বৃত্তে প্রশস্ত 'রেডক্রশ'।

ভার নিচ্ছেন ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন। ১৫ নম্বর সি.সি.এস.-এ গত পাঁচদিন বহাল তবিয়তে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন। পুরোগামী দলে তাঁরই প্রতিভূ হিসাবে জাহাজের দখল নিতে আসে প্রদ্যুম্ন।

জাহাজের সারেঙ, লস্কর, মিস্ত্রী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অর্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত কতকগুলো মানুষ। ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে স্বপ্নেও ভাবে নি। জাহাজ ভাড়া যাচ্ছে সরকারের কাছে। হুকুম পেয়েছে হাজিরা জানাবে দাউদকান্দি থানায়। তার মধ্যে পল্টন-ফৌজ!

ব্যাপারটা পছন্দ হয় নি। মাস্টার মুখ কালো করে নিঃশব্দে তার কেবিনে চলে গেল।

মাস্টারদের জানা নেই। অথচ জাহাজের টনেজ, যাত্রীধারণোপযোগী আয়তন—ফৌজী কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে গেছে। দেড়শো রোগী নিয়ে দাউদকান্দি থেকে গোয়ালন্দ কিংবা সিরাজগঞ্জ অবধি যাতায়াত করবে সুইফট।

সমস্ত দিন কাটে প্রচণ্ড শ্রম ও উত্তেজনায়। কনভয়ে প্রয়োজনীয় তৈজস-

উপকরণ পৌঁচাচ্ছে। অর্থাৎ কম্বল, স্ট্রেচার; গ্রাউণ্ড-শীট, বালিশ, মশারি। তা ছাড়াও রসুইখানার সমস্ত উপকরণ।

সমস্ত মিলে তেরোজন লোক। আন্দাজী সংখ্যা। দুজন সাহেবিখানা রাঁধবার বাবুর্চি এসেছে ময়নামতী রি-ইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প থেকে।

লোকগুলো খেটে খেটে প্রাণান্ত। রান্নার বাসন এসেছে, কোনো খাদ্যোপকরণ আসে নি। কাল সকালে লরী আসবে পাঁচটায়। প্রদ্যুম্ন রেশন আনতে যাবে কুমিল্লা সাপ্লাই ডিপো থেকে। দুপুরে আসবে প্রথম দল রোগী। তারা আসছে ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে। পরিসংখ্যান পেয়েছে। বেশীর ভাগ ম্যালেরিয়া, তার কাছাকাছি আমাশয়, অল্প কয়েকজন যৌন ও চর্মরোগাক্রান্ত। সার্জিক্যাল কেস মাত্র সাত।

ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন সকালের আগে আসবেন না।

আজকে আহার আসবে সি.সি.এস. থেকে। দুবেলাই।

কার্তিকের ছোটবেলা পশ্চিমে হেলে পড়ে। মালগুলো রাস্তায় নামিয়ে কনভয় চলে যায়।

আদ্ধেকের বেশী মাল পড়ে আছে রাস্তায় ও জেটিতে।

খাবারের গাড়ি আসে নি। অপরিসীম শ্রমে ক্লান্ত মানুষগুলো বসে পড়ে জাহাজের উপর-নীচ, যেখানে যার খুশি। সটান শুয়ে পড়ে কেউ-বা।

তারা কাজ করবে না। ক্ষুধায় কাতর মানুষগুলোর উপর হুকুম চালানো যায়। কিন্তু দৈহিক শক্তি তাতে বাড়ে না।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকাল থেকে ভিড় করে আছে রাস্তায়। ফৌজের তামাসা দেখতে এসেছে। যে ফৌজের হাতে বন্দুক নেই, তাদের আর ভয় কি?

ভয় প্রদ্যুম্নর। দু-চারখানা কম্বল কিংবা বেড শীট যদি অলক্ষ্যে উঠে যায়। ক্ষতিটা কিছুই নয়। কিন্তু মর্মান্তিক অত্যাচারের এক অধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর। মাল পাওয়া যাবে না। স্ফীত হবে আর কেউ।

প্রতাপ সিংয়ের ডিউটি পাহারায়। একঝাঁক রোদ মাথায় নিয়ে সকাল সাতটা থেকে দাঁড়িয়ে। তিনটেয় রাশীকৃত কম্বলের উপর সেও দেহ এলিয়ে দেয়। ধমক দিতেও ভরসা হয় না।

এখন এরা ধমক দিচ্ছে। একপাল ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ মানুষ।

জাহাজের বৃদ্ধ মাস্টার এসে দাঁড়ায়।

—বাবুজী, একবার উপরে আসবেন ?

উপরে অর্থাৎ ছাদে। মাস্টারের নেভিগেশান-কেবিনে। জাহাজের লস্কর-খালাসীরা দশটার মধ্যে আহার সমাধা করে জটলা জমিয়েছে যেখানে।

—কেন ?

—দুজন খালাসী পালিয়েছে। আরও দু-একটা হয়তো পালাবে।

—আমি গিয়ে ওদের বেঁধে রাখব ?

ক্রুদ্ধ জবাবেও লোকটির বিনয়ের অভাব ঘটে না।

—আমাদের জাহাজ লড়াই দরমানে যাবে না, এই কথাটাই যদি ওদের বুঝিয়ে বলেন।

—কেন, তুমি বলতে পার না ?

লোকটি অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওকে খুশী করতে প্রদ্যুম্নর এতটুকুও গরজ হয় না। ধমক দিয়ে বলে—তোমার লোক জাহান্নামে যাক। বিরক্ত করতে এসো না।

মুখখানা অন্ধকার করে চলে যায় মাস্টার। জেটির অপর প্রান্তে রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবছে। উদ্বেগের ছায়া পড়েছে মুখে।

খাবারের গাড়ি আসে প্রায় চারটায়। বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা উন্মুক্ত ট্রাকে এসে চেহারাটা ছাড়া স্বাদ আস্বাদন বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো লোকগুলো তাই গোগ্রাসে গেলে।

নেভিগেশান-কেবিনের জটলা পুরোদমে চলছে। কতকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজ আসছে। মাস্টারের মিহি গলা তাদের অনুপাতে অত্যন্ত স্তিমিত। দুজন লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। পিছনে সোলেমান মাস্টার। নেমে এলো উত্তেজনায়। কাছে এসে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়াল। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সহসা কথা বেরোল না কারো মুখ থেকে।

অবশেষে বললে জোয়ান-বয়সী লোকটি।

—স্যার, আমরা আবার কোম্পানীতে ফিরে যেতে চাই।

—কার হুকুমে ?

—হুকুম কারো নয়, স্যার। এমন তো কথা ছিল না। আমাদের লড়াইয়ে পাঠাচ্ছে কোম্পানী একথা বললে আমরা আসতাম না।

—লড়াইয়ে যাচ্ছ এখনই কে বলেছে ?

—ফৌজের কোন বিশ্বাস নেই, হুজুর।

—আর আমি যে বলছি—

লোকগুলো আবার বিব্রত হয়।

—আপনি স্যার দেশী মানুষ, আপনার কথা অবিশ্বাস করি নে। শুনছি দুশো গোরা লোক আসবে কাল। তারা যদি বুকের উপর বন্দুক ধরে বলে, চল লড়াইয়ে। মুখের কথায় প্রাণটা দিতে পারব না, স্যার।

—যারা আসবে, তারা সবাই রোগী।

—ফৌজের কতরকম চাতুরি, স্যার। যদি বলে দক্ষিণে, যায় পূবে।

লম্বা লোকটি এতক্ষণ কথা বলে নি। কাঁচা-পাকা দাড়ি আন্দোলিত করে বলে—আমরা কোম্পানীর নোকরীতে সইন দিয়েছি। কোম্পানীর কাজ করব। ফৌজের কাজ করব ক্যান্?

—সইন আবার কি?

বুড়ো সোলেমান মাস্টার বুঝিয়ে দেয়।

—কোম্পানীর ইগ্রিমেণ্টো নিয়েছে, দেশ যদি জাপানীরা আক্রমণ করে, পালিয়ে গেলে আমাদের ফাটক হবে। ফাঁসিও হতে পারে।

—তাহলে তো চুকেই গেল। এবার পালিয়ে যাও কোম্পানীর কাছে।

—কেন হুজুর?—লম্বা লোকটা যেন ঘাবড়ে যায়।

—সইনটা কি ফাজলামি? পালিয়ে যাও। আমি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।

প্রথম যে লোকটি কথা বলেছিল তার নাম রহমান। সেকেণ্ড ড্রাইভার। সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে। এবার আত্মসমর্পণ করে।

—আমরা স্যার লেখাপড়া জানি নে। হাজার হোক, আপনি আমাদের দেশের মানুষ। আমাদের একটা উপায় বাৎলে দিন।

—চুপ করে কাজে যাও। পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ছেড়ে তোমাদের জাহাজ কোথাও যাবে না।

—আমি তোদের কতবার করে বলেছি।—এবার যেন জোর পায় সোলেমান মাস্টার—বাবু ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের কাছে মিছে কথা বলবে?

প্রত্যুম্ন ভাবে এবার এরা যাবে।

সোলেমান মাস্টার ইতস্ততঃ করে। বলে—শুনছি দুশো গোরা লোক আসবে কাল। আমাদের লোকের গায়ে হাত না দেয়, সেইটেই হুজুর দেখবেন।

—গায়ে হাত দেবে কেন ?

—একে গোরা, তায় পল্টন। শুনছি বড় মারধোর করে।

—আমি বলছি কোনো ভয় নেই।

লম্বা লোকটির হঠাৎ কৌতূহল হল।

—সেদিন গোয়ালন্দ জাহাজে দেখলাম প্যান্ট-কোর্ট-পরা মেমসাহেব পল্টন। ওরা কি গুলি চালায় হুজুর ?

হাসি চেপে রাখে প্রত্যুম্ন। বলে—হ্যাঁ।

—মেয়েছেলে হয়ে মানুষের বুকে গুলি মারে! তোওবা, তোওবা।

—ওরা কি তখন মেয়েমানুষ থাকে, না মানুষ থাকে ?—সোলেমান মাস্টার বলে—মদে বেহুঁস করে বন্দুক হাতে দিয়ে ছেড়ে দেয়।

প্রত্যুম্ন ওখানে দাঁড়ায় না। উপরের ডেকে আসে।

খালের ওপারে উন্মুক্ত মাঠ। ফসল আছে যৎসামান্য। জলে হেজে গেছে। পাতলা ধানের গাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়েছে। মাঠের বেশী অংশই ফাঁকা। কাদা-মাটির রুক্ষতা। বিক্ষিপ্ত সবুজের সমাবেশ। কয়েক মাইল দূরে গ্রাম। ঘন সবুজ বেড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘর-বাড়ি দেখা যায় না।

নির্জনতা যেন ব্যথিয়ে ওঠে। সমুখের বিরাট শূন্যতার মাঝখানে অন্তরের শূন্যতাও যেন এক সুরে মিশে যায়। রূপকণার মুখখানা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

—'এখানে কি আপনার ভালো লাগে না ?'—আসবার সময় প্রশ্ন করেছিল রূপকণা। তার ভালো-লাগা পড়ে রইলো সেখানেই। ভুল করে ফেলেছে। কপটতা করেছে নিজের মনের সঙ্গে। মনের সুরে সাড়া দেয় নি। জীবনের বাস্তব গতিকে অত্যধিক স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে টেনে এনেছে উল্টো পথে।

এতে কি লাভ হল ?

প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকে যায়।

একগাল বিনয়ের হাসিতে এসে দাঁড়ায় মহাবীর প্রসাদ।

—কয়েক আনা পয়সা দেবেন বাবুজী ?

—কত ?

—দিন, যা খুশি।

—কত চাই তোমার ?

—একটা লোক মাছ নিয়ে এসেছে। ছআনা, আট আনা দিলেই দিয়ে দেবে।

গত চারদিন একফোঁটা মাছ পায় নি। রসনা রসিয়ে ওঠে। যেন মহৎ উপকার করছে মহাবীর প্রসাদ।

সোৎসাহে মহাবীর প্রসাদের সঙ্গে জেটিতে নেমে যায়।

পরদিন রোগীর কনভয় আসে সাড়ে এগারোটায়। দু ট্রাক রেশন নিয়ে তাদের ঠিক পিছনে আসে প্রদ্যুম্ন। ফোনে বলা ছিল। সকাল পাঁচটায় জিপ বিয়াল্লিশ মাইল লিফট দিয়েছে।

মেডিক্যাল সাপ্লাইজ নিয়ে দশটা নাগাদ এসেছেন শ্রীকান্তন। গোটা বারো প্যানিয়ার ঔষধ ব্যাণ্ডেজ ইনজেকশান। সঙ্গে এসেছে দুজন গোরা নার্সিং অর্ডার্লি। করপোরাল এবং প্রাইভেট। ওষুধের বাক্স দু-চারটা তখনও জেটিতে পড়ে আছে। প্রচণ্ড তৎপরতা দেখিয়ে ছুটাছুটি করছে নার্সিং অর্ডার্লি দুজন। শ্রীকান্তন দাঁড়িয়ে আছেন উপরের ডেকে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কবির মতো। উনত্রিশটি লায়িং কেস আর গোরাদের কিটের বোঝা বইতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে বারোজন লোক। তামাসা দেখতে গঞ্জের লোক ভিড় করেছে রাস্তায়।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা দশ মোটর-অ্যাম্বুলেন্স। অর্ধেকগুলো থেকে তখনও কিট নামানো হয় নি। বিনা বাক্যব্যয়ে কিট বইছে লোকগুলো। গোরা দুজন ভাঙাচোরা হিন্দিতে প্রচণ্ড দাপট করে বেড়াচ্ছে তাদের উপর। ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন তখনও নদীর দৃশ্য উপভোগ করছেন। আর একপাল বে-সামরিক গ্রামবাসীর ভিড়ের মধ্যে দু ট্রাক ভর্তি রেশন নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রদ্যুম্ন। ছেড়ে যেতেও পারে না। ভিড়ের মধ্যে সাত-দিনের রিজার্ভ রেশনের টিনের কৌটো আর প্যাকবাক্স উধাও হয়ে গেলে কে খোঁজ দেবে।

মিনিট দশেক বাদে বাসদেও এদিকে আসে। নেহাত কৌতূহলের বশে।

—শালা গোরাগুলো কি খাটাচ্ছে দেখুন না, বাবুজী! সকালবেলা থেকে পেটে এক কাপ চা পর্যন্ত পড়ে নি।

—বললে না কেন চা দিতে?

—আমাদের একটা কথাও বোঝে না শালারা। সবাই মিলে বললাম ক্যাপ্টেন সাহেবকে। তিনি মারমুখো হয়ে উঠলেন।

—গাড়ি পাহারা দাও।

প্রদ্যুম্ন জেটিতে আসে।

কিট বইছে ইণ্ডিয়ান পার্সোনেল। শীতের দুপুরেও ঘামে ভিজে উঠেছে জামা।

বাঁশী বাজিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

—ওয়াকিং পেশাণ্টরা নিজেদের কিট বয়ে নিয়ে যাবে। যারা একান্ত অক্ষম তাদের কিট ফেটিগ দিয়ে বয়ে নেওয়া হবে।

এগিয়ে এল নার্সিং কর্পোরাল ম্যাক্-কে। তার হুকুমের রাজ্যে বেগড়া পড়েছে।

—তুমি কে ?—প্রশ্ন করে।

—দেখতেই পাচ্ছ।

—বৃটিশ পার্সোনেলদের হুকুম দিচ্ছ—তোমার সাহস কত !

এই বিষয়ে চুলচেরা বিধান কর্তৃপক্ষের। রাজকীয় সনদে নিযুক্ত নয় এমন কোনো অফিসারের হক্ নেই গোরা ফৌজকে হুকুম দেবার।

বিব্রত বোধ করে প্রদ্যুম্ন।

—এটা হুকুম নয়। ফেটিগের লোক দেয় নি। প্রত্যেকের নিজের কাজ আছে।

—বৃটিশ পার্সোনেলদের ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না। অন্য কোথাও যাও।

অপমানে মুখ কালো হয়ে ওঠে প্রদ্যুম্নর।

বাঁশীর আহ্বানে ইণ্ডিয়ান পার্সোনেলরা জেটিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাজ ভাগ করে দেয়। বাবুর্চি, ভিস্তি, মশালচি ক'জন চলে যায় রান্নার কাজে। বাকীরা যায় রেশন বইতে।

আলতার মতো লাল হয়ে ওঠে ম্যাক্-কের মুখ।

—রোগীদের কিট্ বইবে কে ?

—আমি জানি নে।

—তোমাকে জানতেই হবে—

—আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

ভারি পা ফেলে রেশান-ট্রাকের দিকে এগিয়ে যায় প্রদ্যুম্ন।

গটগট করে জাহাজে ছোটে ম্যাক্-কে।

তড়াক করে গাড়ির উপর লাফিয়ে ওঠে মহাবীর। চালের বস্তা তুলে দেয় একজনের কাঁধে। ডালের বস্তা খুঁজে বের করে।

—অনেক বেলা হয়েছে, খিচুড়ী হয়ে যাক, বাবুজী। আর আলুর চুখা।

প্রতাপ সিং কুমায়ুন জেলার লোক। নীচে থেকে তাড়া দেয়—চা পাত্তি বের কর না, মহাবীর। সবাইকে চা করে খাওয়াচ্ছি।

মহিলা ও পুরুষদের ইণ্টার ক্লাস দুটোতে যথাক্রমে রেশন এবং ক্লোদিং স্টোর করা হয়েছে। চাবিটা ফেলে দেয় প্রতাপ সিং ওর হাতে।

তলব করে পাঠান ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন। যুবা বয়স। ত্রিশ পেরোয় নি। সেনাদলে নতুন ঢুকেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি রেলিংয়ের ধারে। সামনে দাঁড়িয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে করপোরাল ম্যাক্-কে।

—তুমি ফেটিগ তুলে নিয়েছ?

—ফেটিগের জন্য কোনো লোক আসে নি।

—এতক্ষণ যারা করছিল?

—তাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কাজ আছে। তা ছাড়া রান্না-খাবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

—এটা ফিল্ড-সার্ভিস। যে কাজটা প্রথম, সেইটাই আগে করতে হবে। খাবার জন্য কারোকে এখানে আনা হয় নি।

—ওয়াকিং পেশেণ্টরা কিট বয়ে আনবে, এই তো নিয়ম।

—তোমার কাছে নিয়ম শুনতে চাই নে। আমার হুকুম, আগে কিট বয়ে আনতে হবে।

প্রদ্যুম্নর মুখে এক ছোপ কালি ঢেলে দেয় যেন। বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে নেমে আসে।

লোকগুলো আবার কিট বইতে যায়। ক্ষুব্ধচিত্তে।

কিন্তু মুখ খোলে প্রতাপ সিং।

—পার্বতীপুরে সাত হাজার রোগী আমাদের হাত দিয়ে গেল। লায়িং-কেস ছাড়া কারো বিছানা-বাণ্ডিল তো ওঠাতে হয় নি।

—এসব আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই।

—আপনি আপত্তি করলেন না কেন ?

—তোমার কি মনে হয় আমি করি নি ?

—ঠিক আছে। সামনে থেকে সরে যান। বাছাধনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তাই হোক। যা খুশি করুক। ক্ষুব্ধ মন যেন তাতেও কিছুটা সান্ত্বনা পায়। কেবিনে এসে প্রদ্যুম্ন শুয়ে পড়ে। নদীর দিকে কেবিন। বাইরে কি হচ্ছে দেখা যায় না। কেবলমাত্র সোরগোল কানে আসে।

দশ মিনিটও শুয়ে থাকতে পারে না।

কেবিনের দোর ঠেলে সোলেমান মাস্টার।

এগারোটায় জাহাজ ছেড়ে যাবার কথা। গোয়ালন্দ পৌঁছুতে হবে ছটোয়। উজান বেয়ে বিলম্বিত যাত্রার সময়পূরণ সম্ভব নয়। বারোটা বেজেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মাস্টার।

ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তনের মুখেও দুর্ভাবনার ছায়া পড়েছে। কিন্তু ব্যবহারে উষ্মা প্রকাশ করেন।—অত্যন্ত অকর্মণ্য তোমার লোকগুলো। এখনও কিট তুলে শেষ করতে পারল না।

প্রদ্যুম্ন জবাব দেয় না।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর নেমে যান ছড়ি হাতে শ্রীকান্তন।

সোলেমান মাস্টার নেভিগেশান-কেবিনে ফিরে যায়।

সমস্ত জাহাজ গোরা রোগীতে গিজগিজ করছে। শয্যাশায়ী রোগীদের বিছানা পেতে শোয়ানো হয়েছে। বাকী অনেকে গুছিয়ে বসেছে বিছানা পেতে। অধিকাংশ ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরো স্বাধীনতায় ডেকে, নীচে, জেটিতে, রাস্তায়। অতি উৎসাহী দু-চারজন বাজারে গেছে সিগারেট-দিয়াশলাইয়ের সন্ধানে।

প্রদ্যুম্ন মন স্থির করে নেয়। নির্লিপ্ত থাকবে। অপমানেও—কর্তব্যেও। কোথায় কি হচ্ছে দেখে বেড়াবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ অবশিষ্ট নেই। ক্লোদিং-স্টোরে এসে গা এলিয়ে বসে। সিগারেট ধরায়।

সিগারেট শেষ হবার আগেই মগ-ভর্তি চা নিয়ে হাজির হয় প্রতাপ সিং।

—আপনাকে খুঁজেই পাচ্ছি নে—

—কিট ওঠানো শেষ হয়েছে ?

—এত শীগ্‌গির ?—হাসে প্রতাপ সিং।—সাহেব নিজে খবরদারি করছেন।

যখন উপরে যাচ্ছেন, সবাই চলে আসছে নীচে। আবার নীচে এলে উপরে। কিট উঠছে আর কটা!

প্রতাপ সিং আবার হাসে।

ভিড়ের মধ্যে প্রতাপ সিং নিজেও পালিয়ে এসেছে। বয়লার থেকে বের করেছে ফুটন্ত জল। চা করেছে ড্রাইভারদের কুঠুরীতে বসে।

অন্তদের চা পরিবেশন করতে চলে যায় প্রতাপ সিং।

ডেকের পিছনের কোণে গোল হয়ে সব চা খেতে বসে।

সেখানেই আবির্ভূত হন শ্রীকান্তন। প্রত্যুম্নরও ডাক পড়ে।

—এরা চা পেল কোথায়?

—এদের রেশনের চা।

—তার মানে তুমি দিয়েছ?

—কাজ থেকে আমি ছুটি দিই নি।

—পাজীগুলো অত্যন্ত ফাঁকিবাজ।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় রায়ধারী।

—কসুর করে থাকি, কোয়ার্টার-গার্ড দিন। গালি দেবার আপনার কোনো হক্ নেই।

—একদম চুপ—চেঁচিয়ে ওঠেন শ্রীকান্তন।

প্রত্যুম্নকে লক্ষ্য করে বলেন—এর কাঁধে দুটো কিট চাপিয়ে জেটির আপ-ডাউন পাঁচ মিনিট ডাবল-আপ করিয়ে নিয়ে এসো।

প্রত্যুম্নর মুখ অসন্তোষে আবার কালো হয়ে ওঠে।

—একে একলা?

—সহজ ইংরেজী কথার মানে বুঝতে পার না?

প্রত্যুত্তর প্রত্যুম্নকে দিতে হয় না। প্রতিবাদ করে মহাবীর।

—আমাদের খাবার সময় এগারোটায়। একটা বাজছে, না খেয়ে কোনো কাজ করতে পারব না।

—এটা ফিল্ড। না খেতে পেলেও কাজ করতে হবে। একটি কথাও কারো মুখে শুনতে চাই নে।

—ফিল্ড বলেই কি রান্নার লোককে ফেটিগে লাগিয়ে ওদের উপোস রাখতে হবে?—মন্তব্য না করে থাকতে পারে না প্রত্যুম্ন।

—তোমার দুঃসাহসও কম নয়। যা বলছি তাই কর।

প্রদ্যুম্ন আর কোনো কথা বলে না। রায়ধারীকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসে। কাঁধে দুটো কিট চাপিয়ে দেয়। অবশ্য হাল্কা দুটো কিট। জেটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার্চিং অর্ডার দেয়।

গঞ্জের লোক একদল যাচ্ছে, অপর দল আসছে। রাস্তার অপর ধারে ভিড় লেগেই রয়েছে। কাঁধে বোঝা চাপিয়ে অকারণে একটা লোককে ছোটানোর তামাসা উপভোগ করছে সবাই।

থানার পেটা-ঘড়িতে একটা বাজলো। ছাড়া পেল রায়ধারী।

ডেকের উপর ম্যাক্‌-কে এবং প্রাইভেট ওয়েব রোগীদের তদারকে ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন নিজেই ফেটিগ খাটাচ্ছেন। আরও গোটাকয় কিট অবশিষ্ট। কাজের গতি তেমনি শ্লথ।

রেশন-টিন আর কাঁটা-চামচ বের করে লাঞ্চের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে গোরাগুলো।

নীচে নেমে এসেছে ম্যাক্‌-কে। কথা বলছে ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তনের সঙ্গে। সোলেমান মাস্টার আবার এসে দাঁড়াল।

—ফৌজের কাণ্ড দেখলে ডর লাগে বাবুসাব। আমাকে কিন্তু পরে দোষ দেবেন না।

—তুমি কি করবে ?

—যদি বলেন, আমার খালাসীদেরও পাঠিয়ে দিই। তাড়াতাড়ি মাল তুলে নিক।

—এই বোকামি করো না মাস্টার। পেয়ে বসবে। প্রতিবারেই ফেটিগ জোগাতে হবে তোমাকে।

—এখন জাহাজ ছাড়লেও চারটায় পৌছান যেতো।

—তোমার কি ? যখন হুকুম হবে তখন ছাড়বে।

—সাহেবকে আপনি জানিয়ে রাখুন, বাবুজী।

সাহেবের কাছে যেতে হয় না। ম্যাক্‌-কের সঙ্গে শ্রীকান্তন নিজেই এগিয়ে আসেন।

—এদের লাঞ্চের কি ব্যবস্থা হবে, বোস ?

—কি করব হুকুম করুন।

—বুদ্ধি আক্কেল তোমারও কিছু আছে—একি আমি আশা করতে পারি নে ?

—আমার বুদ্ধি গোড়াতেই নেন নি। অপব্যবহার করে লাভ কি?

ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তনের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ তির্যক দৃষ্টিতে তাকান।

সঙ্গে সঙ্গে সোলেমান মাস্টারের বক্তব্যও জানিয়ে দেয় প্রদ্যুম্ন।

শ্রীকান্তনের মুখে পরিপূর্ণ হতাশা ফুটে ওঠে।

—তোমার এই ফাঁকিবাজ লোকগুলোই আমাকে বে-ইজ্জৎ করাতে বসেছে, বোস।

প্রদ্যুম্ন জবাব দেয় না।

—কই, কিছু বললে না?

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন।

সোলেমান মাস্টার চলে যায়। ম্যাক্-কে বোকার মতো ডেকে ফিরে আসে। জেটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাঁক-ডাক শুরু করেন শ্রীকান্তন।

প্রদ্যুম্ন সরে যায় ওখান থেকে—রেশন-ট্রাকে।

গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চিনি দিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে বাসদেও। ড্রাইভারের ভাগ্যেও জুটেছে। ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হল বাসদেও।

—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, হুজুর—অপরাধ-কুণ্ঠিত কৈফিয়ত দেয়।

প্রদ্যুম্ন কোনো জবাব দেয় না। কাজটা নিঃসন্দেহে গর্হিত। কিন্তু একগুঁয়েমি করে মানুষকে অনাহারে রাখার চেয়ে নয়।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

জাহাজের উপরের ডেকে চিৎকার করছে একদল ইংরাজ ফৌজ। রেশন-টিন বাজাচ্ছে। কান বধির হয়ে যাবার মতো। হয়ত ওদেরও দোষ নেই। সমস্ত রাত ট্রেনে কাটিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এসেছে কুমিল্লা। আরও দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে অনেকেই। দু-একদিনের পথ। ট্রাকে।

ম্যাক্-কে আবার নীচে নেমে এল। একা নয়। সঙ্গে ক্ষুধার্ত লোকগুলোর সাত-আটজন প্রতিভূ। দু-একজন করে বাড়ছে। ভিড় জমে উঠছে শ্রীকান্তনের চারপাশে। তাদের কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন শ্রীকান্তন। একসঙ্গে অনেক-গুলি লোক কথা বলায় মিশ্র কলরব ছাড়া ট্রাক থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভিড় সরে এলো ট্রাকের কাছে।

—বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ?—শ্লেষের কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন শ্রীকান্তন।

—রেশান স্টীমারে না পৌঁছালে কি করতে পারি ?

এগিয়ে এলো একজন সার্জেণ্ট। লম্বাটে রোগা। সমস্ত দেহে অম্লান অপরিচ্ছন্নতা।

—তোমার রেশন দশ মিনিটে জাহাজে পৌঁছে দিতে পারি। তুমি ক'মিনিটে খাবার দিতে পারবে ?

—দশ মিনিটে।

—তোমার কি মাথা-খারাপ ?—ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তনের কণ্ঠে বিস্মিত উত্তেজনা।

—আপনি সরে দাঁড়ান।

সরে গেলেন না, সরিয়ে দিলে। ত্রিশ-চল্লিশজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রাক দুটোর উপর। দ্রুত উঠে যাচ্ছে বস্তা আর পেটিগুলো। তুমুল কর্মব্যস্ত প্রতাপ সিং, রাম আওতার, রায়ধারী, মহাবীর। বয়লার থেকে ফুটন্ত জল এনে ডুবিয়ে দিচ্ছে কর্নড বিফ আর মাছের টিনগুলো। চটপট রুটি কাটছে কয়েক জোড়া গোরা হাত। খুলছে জেলির টিন। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। এর মধ্যে হুকুম নিয়ে গেল সোলেমান মাস্টার।

সুইফট জাহাজের প্রথম যাত্রার বাঁশী বাজলো।

দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের রোগী অপসারণ ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। কথা ছিল গোয়ালন্দে জাহাজ থেকে রোগী নেমে যাবে। সেখান থেকে সিক্-স্পেশাল নয়—অ্যাম্বুলেন্স-ট্রেনে কলকাতা হয়ে পশ্চিম।

অ্যাম্বুলেন্স-ট্রেন আসে নি। আর.টি.ও. অফিসে নির্দেশ এসেছে। সিক্-স্পেশাল দেওয়া হয়েছে সিরাজগঞ্জে।

পদ্মা থেকে ব্রহ্মপুত্রের খাড়ি বেয়ে সিরাজগঞ্জ। যেখানে সেখানে চড়া পড়েছে বিস্তর। সোলেমান মাস্টারের মুখ দুশ্চিন্তায় গম্ভীর।

—এইযে খাড়ি বাবু, কেবল বর্ষাকালেই এতে নিশ্চিন্তে জাহাজ চালানো যায়। পাঁচমাইল-দশমাইল জমিন জলের মাঝখান দিয়ে নিশানা চিনে যাওয়া তবু সহজ। এখন জল মরে গিয়ে একশ'টা খাল জেগেছে। কোনটা দিয়ে স্রোত বইছে, কোনটায় নয়, বুঝাই মুশকিল। জাহাজ না আটকে গেলে ভাগ্যি।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে জাহাজ খাড়িতে প্রবেশ করে। নীল জল। পদ্মার মতো ঘোলাটে নয়। শান্ত। বিরাট বালুচর ধু-ধু করছে। মাঝখানে

কোথাও এক-দু মাইল লম্বা-চওড়া ঝিল। আবার কোথাও বালিতে মাটির আঁশ—নল-খাগড়ার বন। সোলেমান মাস্টার বলে—শূয়র আসে এই জঙ্গলে। আর সাপের তো আম-দরবার;

রোগীদের নৈশাহার শেষ হল সাতটায়। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে প্রদ্যুম্ন। আজ সন্ধ্যা থেকেই চোখে ঘুমের আমেজ। কেবিন গিয়ে শুয়ে পড়ে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখনও ওঠে নি। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীচে তরল অন্ধকার। কেবিনের জানালা দিয়ে আবছা দেখা যায় অনেকদূর পর্যন্ত। জাহাজ পাঁচ-ছ মাইল বেগে চলেছে। তার বেশী বেগে চালাতে রাজী নয় সোলেমান মাস্টার। নীচে হিন্দুস্থানী ভাষায় বাসদেও কাওয়ালী ধরেছে। একজন খালাসী অনবরত লগি ফেলছে জলে। আর সুর করে একটানা বলছে—হানি হাইলাম না, হানি হাইলাম না। হাতো হানি—।

পেরুমলের ডাকে ঘুম ভাঙে। দক্ষিণ-ভারতীয় কুক পেরুমল। তখনও চারটে বাজে নি। পাঁচটায় সাহেবদের গান-ফায়ার। অর্থাৎ বেড-টী। চা দুধ চিনি চাই। একচোখ ঘুম নিয়ে উঠে যায় প্রদ্যুম্ন। ফিরে এসে দাঁড়ায় কেবিনের সামনে রেলিংয়ের ধারে।

ব্রহ্মপুত্রের কালো জল প্রোপেলারে ভেঙে যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের আধো চাঁদ উঠেছে কখন। জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে বালুচর। দূরে, অনেক দূরে, যেন জলের উপর চাঁদটা নেমে এসেছে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নৃত্য করছে রূপালী স্বপ্ন। কার্বন-সার্চলাইট ঘুরিয়ে আড়কাঠি খুঁজছে সোলেমান মাস্টার। নীচের লোকটা একঘেয়ে সুর করে বলছে—হানি হাইলাম না।—কণ্ঠ ক্লান্ত। হাল ঘোরাবার যান্ত্রিক শব্দ নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। ডেকের আলো টিমটিম করে জ্বলছে, আর তার নীচে দুশো লোক পড়ে আছে মৃতের মতো।

দিনের ক্ষোভ ও ক্লান্তি এখনও শীতের হাওয়ার মতো সর্বাঙ্গ যেন জড়িয়ে আছে। কিন্তু মন যেন চলে যায় বহুদূরে। পৃথিবী আকাশ ছাড়িয়ে। এক চিন্ময় শূন্যতার মধ্যে।

নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল সেই লম্বা লোকটি। ডেভনশায়ার রেজিমেণ্টের রোগা সার্জেণ্ট লকহার্ট।

—মাফ করবেন, সার্জেণ্ট। লোভ সামলাতে পারলুম না। অপূর্ব! আমাদের দেশে এ দৃশ্য দেখা যায় না।

—তাহলে বলুন সৌভাগ্য,—এ দৃশ্য দেখে গেলেন।

—চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে কয়েকমুহূর্ত চোখের তৃপ্তি। এর মধ্যে কোনো সান্ত্বনা নেই।

—নিশ্চয় আছে। যতক্ষণ ডুবে রইলেন, ততক্ষণই সান্ত্বনা।

—হ্যাঁ ভুলে থাকাই সান্ত্বনা।

নিঃশব্দে অনেকগুলো মিনিট কেটে যায়। জ্যোৎস্নার ওপর ম্লান আস্তরণ নেমে আসে। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শুকতারা। রাত্রিশেষের সঙ্কেত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

—একটি সুন্দর রাত শেষ হয়ে গেল।—অর্ধ-স্বগত কণ্ঠে বলে প্রদ্যুম্ন।

—সত্যি, এক অপরূপ পৃথিবীকে দেখলাম!

থামলো লকহার্ট। মিনিটখানেক নীরব থেকে বললে—অনেক দীর্ঘরাত নিঃশব্দে আমাকে জেগে থাকতে হয়, সার্জেণ্ট।

—বিরহ-বেদনা—!

—না, বীভৎসতা। কী মর্মান্তিক!

একটা দীর্ঘশ্বাস প্রোপেলারের জলভাঙা শব্দে মিশে যায়।

—তিন বছর আগে যখন জাহাজে এদেশে আসি, অনেকগুলো তরুণ মুখ প্রতিটি মুহূর্ত ঘিরে থাকতো। হাস্যে কৌতুকে পরিহাসে উন্মুখ করে রাখতো। মৃত্যুর দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তার ভীতি কোনোদিন কাছে ঘেঁষে নি। তাদের অনেকেই আজ নেই। রাত্রে চোখ বুজলেই সেই মুখগুলো ভেসে ওঠে। ঘুমের মধ্যে তাদের রক্তাক্ত বীভৎস চেহারাগুলোর স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় অন্ধকারে তারা যেন আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

—এ একান্তভাবেই আপনার মানসিক দুর্বলতা, সার্জেণ্ট।

—আজকেও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম। ফায়ারিং লাইনে ডিগ-আউটে বসে আছি। সন্ধানী-আলোয় আকাশ জ্বলে উঠেছে। চারিদিকে বন্দুক-কামানের গর্জন একটা গুলি আমার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। অতীতের পথে আমিও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি, সার্জেণ্ট। আমার স্বজন, আমার দেশ জীবনে আর কখনো দেখা হবে না।

লকহার্টের কণ্ঠ কাঁপে। স্বর ধরে যায়।

বালুচরের শেষ সীমানায় আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে।

চারদিন কেটে গেল জলের উপর।

বাঁক ঘুরতেই মাইলখানেক দূরে ভেসে উঠলো দাউদকান্দির বন্দর। জীর্ণ ভগ্ন নৌকাগুলো মড়ক-লাগা গো-ভাগাড়ের কঙ্কালের মতো ছড়িয়ে আছে। খালের জল দেখা যায় না। নৌকাগুলোর মাঝখানে কালো চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাদা চক্ চক্ করছে জাহাজের একাংশ।

—হোই মুনিরুদ্দীন সাহেব—হোই মুনিরুদ্দীন সাহেব—

এস. এস. লার্কের উপরের ডেকে রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল একজন আধাবয়সী মানুষ। কাঁচাপাকা দাড়ি, ফরসা পায়জামা, ময়লা চায়না-সিল্কের শার্ট, ওয়েস্টকোট।

—আদাব, সোলেমান চাচা।

—আদাব। তোমাগোরেও ইখানে পাঠাইলো?

—হঃ। কম্পানি মিলিটারি কনটাগ হইছে।

—কোন কাম করাইবো?

—তোমাগো মতোনই রেড-কিরশ মার্কা এহানে লাগাইছে। লুকে কইছে হাসপাতাল। তোমাগোরে কি কাম করাইচে?

—সিরাজগঞ্জ খেপ দিয়া আইলাম গোরা ফৌজের।

জাহাজ এলো আরেকটি। কিন্তু লোক বাড়লো ছজন। দুজন করে বাবুর্চি, ভিস্তি এবং দিশী নার্সিং আরদালী। মোটা তারের দড়ি দিয়ে দুটো জাহাজ একসঙ্গে বাঁধা হল। কাঠের সিঁড়ি পেতে দেওয়া হল দু-জাহাজের মাঝখানে। একসঙ্গে একব্যবস্থায় দুখানি জাহাজ চলবে।

প্রথম দিন দাউদকান্দি মনে হয়েছিল একখণ্ড কবিতা। বাইটনলের খালের দুধারে ফাঁকা মাঠ। সোনালী ধান। গোটাকয়েক অতি সাধারণ গণ্ডগ্রাম। গোটা তিন বাঁক পার হয়ে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়ে মুন্সিগঞ্জ শহরের কোঠা-বাড়িগুলো শীতের সোনালী রোদে ঝক্‌মক্ করে। যেন বহু সাধনায় আঁকা শিল্পীর একখণ্ড ছবি।

আর পদ্মা! বঙ্গলক্ষ্মীর কীর্তিনাশা কলঙ্কিনী মেয়ে। সাহিত্যের অঙ্গনে তার চঞ্চল পদক্ষেপ। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, বালুচরে, কাশবনে। গদ্যে ও কবিতায়।

জাহাজ যখন উজান চলে, রোগীদের অভিযোগ, কলহ, খাওয়ানো, বসানো,

শোয়ানো প্রভৃতি দায়িত্বের বহুধা দাবীতে বিশ্বজগৎ দূরে থাকে। স্নানাহারের কথা ভাববার অবকাশ থাকে না। আর জাহাজ যখন ভাটির টানে ফিরে আসে—খালাসীরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। পার্সোনেলরা নীচে রোদে বসে তাস খেলে। কিংবা রেশন-টিন বাজিয়ে দেহাতি সুরে সঙ্গীতচর্চায় মাতে। কেবিনের দরজা বন্ধ করে ম্যাক্-কে এবং ওয়েব ফ্লাশ খেলে। আর শ্রীকান্তন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এক বোতল মদ উজাড় করেন।

জাহাজে মদের অভাব নেই। রাম্ হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি—রকমারি মদ। ভারতীয় রোগীদের এক আউন্স এবং বৃটিশদের দু আউন্স দৈনিক বরাদ্দ। রেশন নয়—মেডিক্যাল কমফর্ট। ভারতীয়রা অধিকাংশই মদ খায় না। বাড়তি মদ জমা থাকে স্টোরে। সুইপার থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব অবধি ভোগে লাগায়। ম্যাক্-কে আজকাল দুবেলাই খোশামোদ করে মহাবীর প্রসাদকে। জোগান যাতে ব্যাহত না হয়। শ্রীকান্তন মদে ডুবে আছেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রথম কিছুদিন দুচোখ ভরে ফিরতি পথের মাদকতা পান করে কেটে যেতো। গ্রাম-বাংলার মানুষ প্রদ্যুম্ন। তার চোখে কিছুই নতুন নয়। ঐ সহজ জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পুরাতন জীবনের প্রতিটি খণ্ডছবি নতুন আবেদনের বেদনায় দেখা দেয়।

কৃষাণের ছেলে জাল ফেলে মাছ ধরছে। নদীর পাড় ধরে একপাল গরু নিয়ে চরাতে যাচ্ছে মাঠে। গ্রামের বধূ আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে জাহাজ দেখছে ঘোমটার ফাঁকে। সন্ধ্যায় ঘড়া ভরে ঘরে ফিরছে। সর্বনাশী পদ্মার জলস্রোতে ধস নেমে পতনোন্মুখ পরিত্যক্ত গৃহ। আর গ্রাম পেরিয়ে অবারিত মাঠ। ধূ-ধূ বালুচরের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে কুটিল জলরেখা।

কেবিনের সামনে উন্মুক্ত ডেকে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে যখন ভালো লাগে না, সিঁড়ি বেয়ে নেভিগেশান-কেবিনে চলে আসে প্রদ্যুম্ন। তার জন্য টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সোলেমান মাস্টার।

—অই-যে জলের পাকগুলাইন দেখছেন, বাইস্যা কালে ওয়ার চক্কর দেখলে ভিরমী খাইবেন, বাবু। আঃ, ঢেউয়ের কি ডাক! একটু বাতাস আইলেই কি সোঁ-সোঁ আওয়াজ! দুই মাইল দুর থাক্যাও হুনা যায়। আর তার মধ্যে অই পাকগুলাইন অজগ্‌রের মতন খাপ পাইত্যা থাকে! বড় বড় মহাজনী নৌকাও একেবারে গিল্যা ফালায়

পদ্মার উপর চল্লিশ বছর জীবনের টুকরো কাহিনী বলে সোলেমান মাস্টার। সেই কোন গ্রাম ছিল রাজবাড়ির বাঁক ছাড়িয়ে। আজ তার চিহ্নও নেই। লোকচক্ষুর অগোচরে মৃৎস্তরের ভেতর দিয়ে মাইলের উপর সরে গেল নদী। তারপর ধসে পড়লো গোটা গ্রাম। বাড়ি-ঘর গাছপালা কুটোর মতো ভেসে গেল।

গ্রামের নাম স্মরণ করতে চেষ্টা করে সোলেমান মাস্টার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সোলেমান মাস্টারের গল্পেও ক্লান্তি আসে। দূর দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে প্রদ্যুম্ন বিমনা হয়। তারপর হঠাৎ আর ভালো লাগে না। কেবিনে ফিরে আসে।

নদী, নীল আর নির্জনতার একঘেয়েমি দুঃসহ হয়ে ওঠে। পার্বতীপুর ছেড়ে আসার অনুশোচনায় নিজের নির্বুদ্ধিতাকেই সে দায়ী করে। অনুভব করে, নিজের মনের সঙ্গে ছলনা করে ভুল করে ফেলেছে।

চোখ বুজে নির্জীবের মতো শুয়ে থাকে সে। একসময় আসে মহাবীর প্রসাদ।

—ঘুমিয়ে পড়লেন বাবুজী?

—না।—প্রদ্যুম্ন চোখ খোলে।

—আনব?—মুচকি হাসিতে প্রশ্ন করে।

প্রদ্যুম্নর লোভ হয়। কিন্তু তখনি মানসিক পরাজয়ের আশঙ্কা প্রবল নিষেধ জানায়।

জাহাজে মাত্র দুজন মদ খায় না। প্রদ্যুম্ন আর মহাবীর। অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছে মহাবীর।—আপনি না খেলে আমিও খাব না।—অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতি সে পালন করছে। এইটুকুই প্রদ্যুম্নর গর্ব। সংযমের পরীক্ষায় মহাবীরের কাছে সে হার মানতে রাজী নয়।

সমস্ত জাহাজখানায় নিঃসঙ্গ এই দুজন। প্রদ্যুম্ন আর মহাবীর। অন্যরা যখন বোতল নিয়ে বসে, মহাবীর উপর-নীচ করে। হোলে নেমে খালাসীদের সঙ্গে বয়লারে কয়লা মারে। নিশ্চয়ই বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। উপরে এসে প্রদ্যুম্নর দুতিন জোড়া জুতো নিয়ে রোদ-পিঠ বসে এক ঘণ্টা ধরে পালিশ লাগায়। কিংবা কাছে এসে আসন-পিঁড়ি হয়ে ডেকে বসে।

—আপনার বাবুজী ফৌজে আসা ঠিক হয় নি।

—হুঁ।

—লেখাপড়া শিখেছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার নোকরী সিভিলেই পেয়ে যেতেন।

—আগে বলিস নি কেন?

—আমি বলব কোথা থেকে। তখন যদি আপনার সঙ্গে দেখা হতো, কোন শালা লড়াইয়ে আসে!

আবার হাসে মহাবীর। বিচিত্র মানুষটি। মুখে হাসি, অন্তরে মমতা, চরিত্রে সংযম। অথচ এর মধ্যেই আছে অগাধ অন্ধকার। যার দৌলতে অপাঙক্তেয় সে।

মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম সুখলাল। জেল খেটেছে দুবার। টাঁকশালে কাজ করতো। গলার থলিতে চৌদ্দ টাকা পর্যন্ত সরিয়ে আনছিল। ধরিয়ে দিলে সাঙাৎ। খেটে এল দেড় বছর। আবার সেই সাঙাতের মাথা ফাঁক করে তিন বছর। বেরিয়ে এসে শুনলো বন্ধু-বান্ধব দেশওয়ালী লোক কেউ গেছে লড়াইয়ে, বাকীরা ব্ল্যাক-আউটের কলকাতা থেকে পালিয়েছে ভয়ে। কলের জল খেয়ে দুদিন ঘুরে বেড়াল রাস্তায়। মে রোডে লড়াইয়ে নাম লেখাবার লাইন পড়েছে। সেও দাঁড়িয়ে গেল। দাগীকে পাছে ফিরিয়ে দেয়, সুখলাল হল মহাবীর।

জেল-জীবনের কাহিনী দিনে অন্ততঃ একবার শুনিয়ে যাবেই মহাবীর। হয়ত অনেক আক্ষেপ জমা হয়ে আছে তার। এলোমেলো বকুনির নিমগ্নতায় সেই পীড়া থেকে যেন পালিয়ে বেড়ায়।

বকবে আপন-মনে। যতক্ষণ ভালো লাগে। যখন ভালোও লাগবে না, সাড়াও পাবে না, আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবে। আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাবে।

আবার আকাশ মাঠের শূন্যতা আর প্রোপেলারে জল ভাঙার শব্দ। জাহাজের পাশে পাশে উড়ে বেড়াবে দু-একটা গাঙচিল। ফ্যানের ঝটকায় যদি দু-একটা চুনোমাছ ভেসে ওঠে, রোদে চক্‌চক্ করবে তাদের ডানা। মাথার উপর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়বে। ভেসে উঠবে দাউদকান্দির বন্দর।

জেটিতে ভিড়বার মুখে বাঁশী বাজায় দুখানা জাহাজ। আগমন-সংবাদ ঘোষণা করা হল দাউদকান্দির বন্দরে। ডাকঘর থেকে চিঠি বিলি করে যাবে। অধিকাংশ সরকারী চিঠি। পার্সোনেলদের দু-একখানা।

কেশবকে চিঠি দিয়েছে প্রায় একমাস।

জাহাজ প্রতিবার ফিরে আসে। উদগ্রীব চিত্তে প্রত্যাশা করে প্রত্যুত্তর। আরেকটা আশাভঙ্গের বেদনা যোগ হয়।

চিঠি অনেক আসে—শ্রীকান্তনের। ভদ্রলোক স্ত্রীর কাছ থেকে গড়ে দৈনিক একখানা চিঠি পান। নিজেও তেমনি লেখেন। আর আসে ফৌজী ইস্তাহার ও নির্দেশ। হালে পোস্টার আসছে গাদা গাদা।

'বোবার শত্রু নেই'

'গুজবে কান দিও না'

'অসতর্ক উক্তি নিজের জীবন বিপন্ন করে'

'দেওয়ালেরও কান আছে'

'See, Think, but don't Speak'

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে কুমিল্লা শহর। আই. এস. ডি-র দেওয়ালে, সি. সি. এস্.-এ; ময়নামতী রেস্ট ক্যাম্পে যেন পোস্টারের উৎসব।

একটা চাপা নিশ্বাস বইছে। জল্পনা, কল্পনা, উদ্বেগ। স্পষ্ট কেউ কিছু জানে না। অসাধারণ কিছু ঘটছে। হয়ত দূরে কিংবা কাছে। কিংবা সম্ভাব্য মুহূর্ত এসে গেছে।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। রাত্রে নদী কুয়াশায় অন্ধকার। কার্বন-লাইটের আলো কুয়াশার স্তরে স্তরে রহস্যের বিচিত্র ছায়া ফেলে থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টি দূরগামী নয়। জাহাজ চলে মন্দগতিতে। উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটায় জাহাজমোড়া ক্যানভাসের ত্রিপলগুলো পতপত করে। রঙিন তরল পদার্থে শীতের অবরোধ সৃষ্টি করে কেবিনের নিভৃতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন শ্রীকান্তন। মানুষটিকে দেখা যায় না। তাঁর হাঁক-ডাক শোনা যায়। তাঁর নির্দেশ, হুকুম, আবদার।

জাহাজ যখন দাউদকান্দি পৌঁছায়, এই মানুষটিরই কুমিল্লা যাবার ট্র্যান্সপোর্টের আবেদন নিয়ে ফোন করে প্রদ্যুম্ন। গাড়ি আসে। তিনি বেরোন। তাঁর হ্যাভারস্যাক বয়ে নিয়ে যায় রামফের। দর্পিত পা ফেলে তিনি চলে যান।

এখানে কোথাও ভালো-লাগা নেই। একঘেয়েমি আর বীতশ্রদ্ধা। ঘৃণা আর অবাস্তব স্বপ্নের পিছু ধাওয়া।

অবশেষে পরিবর্তনের আভাস এলো। সি. সি. এস্.-এ ফোন করেছে অতীন রায়। বললে—গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আয়।

—বড্ড হাওয়া।

—মরবি নে। আর দেখা নাও হতে পারে।

—কেন?—বদলী?

—চুপ। দেওয়ালের কান আছে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে ব্যারাকগুলোতে।

সি. সি. এস্.-এর গার্ড-রুমের সামনে থামলো স্টেশন ওয়াগন এগিয়ে এলো অতীন রায়। হাতঘড়িতে সময় দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

রাস্তায় এলো দুজনে। ব্ল্যাক-আউটের শহর অন্ধকার। ছায়ার মতো দু-চারটে মানুষ চলাফেরা করছে। প্রদ্যুম্নর কাঁধে হাত রাখে অতীন রায় পাশাপাশি এগিয়ে চলে দুজনে।

হয়ত এই শেষ দেখা। ১৫ নম্বর সি.সি.এস্.-এর কুমিল্লায় অন্ত শেষ রজনী। এই কথাটা বলতেই এতটা পথ ডেকে এনেছে অতীন রায়।

হৃত ব্রহ্ম-সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে প্রথম অভিযান শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে আরাকানে। আর্টিলারি এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে ইনফ্যান্ট্রি। এগিয়ে যেতে হবে মেডিক্যাল ব্যবস্থাকেও।

—দেখ, যুদ্ধের গল্প বইয়ে পড়েছি, আবার ফিরে গেলে লোকে আমাদের কাছেও শুনতে আসবে। আগাগোড়া মিথ্যে বলার চেয়ে না-হয় কিছু চোখে দেখে এলাম।

কথাগুলো উদ্দীপনাপূর্ণ। কিন্তু অতীনের কণ্ঠ আতঙ্কে নিস্তেজ।

প্রদ্যুম্ন কিন্তু সেখানে খোঁচা দেয় না। তবু শ্লেষের কণ্ঠে বলে—দৃশ্যটা খুব মজাদার—না রে অতীন?

হাসে, না অতীনের মুখবিকৃতি ঘটে, অন্ধকারে বুঝা যায় না। বলে—খাকী পোশাক পরেছি বলেই খুব বীরপুরুষ, মনে এ বড়াই নেই, প্রদ্যুম্ন। তবু মনকে একটা স্তোক দিয়ে রাখা চাই তো!

বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তা প্রদ্যুম্নকেও বিষণ্ন করে।

গাছের শাখায় পাতায় অশরীরী অন্ধকারগুলো বিশ্রী উদ্দেশ্যে যেন ওৎ পেতে আছে। নিঃশব্দে পথ চলে দুজন।

—তুই একটা বোকা।—অতীন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

—মানে ?

—পার্বতীপুরের সেই মেয়েটা তোকে ভালোবাসতো। শৈলেনটা চালাক, তা ছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে ওদের সঙ্গে মিশেছেও। সে টের পেয়েছে। মেয়েটা তাকে ভালোবাসে এই ব্লাফ দিয়ে ও আগাগোড়া তোকে ঈর্ষা করেছে।

—আমাদের জীবনে ভালোবাসার কি স্বার্থকতা অতীন ? জেনেশুনে কোনো মেয়ের সর্বনাশ করা যায় না।

—বড় বড় দর্শন রাখ। কি স্বার্থকতা আছে জীবনের ? একদিনের তরেও কি প্রাণভরে উপভোগ করতে পেরেছি। জন্মেছি, মরে যাচ্ছি। এর মধ্যে আত্মত্ব আছে কোনখানটায়।

—অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কোথায় গিয়ে ঠেকবো কে জানে। আরেকটা জীবন বরবাদ করা কি ঠিক হতো।

—বাজে কথা রাখ। নিজের পুণ্যের জোর তো বুঝতেই পারছিস। সমস্ত জীবন লাথিঝাঁটা খেয়ে এখন খাচ্ছিস বুটের ঠোকর। একটা সতীসাধ্বী মেয়ের পুণ্যে হয়ত এযাত্রা বেঁচে যেতিস।

শহর-উপান্তের এক মাইল রাস্তা অতিক্রম করে জনবহুল অঞ্চলে পোঁছায় দুজনে। সামনে সিনেমা-হল। বাইরে আলো নেই। দোকানের আলো যাতে বাইরে ঠিকরে না আসে তার সতর্কমূলক ব্যবস্থা।, অন্ধকারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিনেমা-দর্শনার্থী মানুষ।

টিকিট কিনে দুজনে ভিতরে যায়। বই চলছে। কানের কাছে মুখ আনে অতীন। বলে—জাহাজ আবার কখনও সিরাজগঞ্জ গেলে পার্বতীপুর ঘুরে আসিস।

—ছুটি ?

—অসুবিধে কি। জাহাজ যতক্ষণে দাউদকান্দি পৌছাবে তুইও ট্রেনে কুমিল্লা পৌছে যাবি।

—যে মোহ থেকে পালিয়ে এলাম, আবার সেখানেই !

—বোকামি করিস নে। সমস্ত অন্তর দিয়ে কেউ পথ চেয়ে আছে, ভাবতেও কি ভালো লাগে না ?

—স্বপ্নবিলাস মাত্রই চিত্তগ্রাহী, অতীন—

—স্বপ্নশূন্য জীবনের কোনো সান্ত্বনা নেই।

নিজের মনে প্রদ্যুম্ন কোনো নিশ্চিত জবাব খুঁজে পায় না।

অতীন রায় চুপ করে গেছে। হয়ত কোনো ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করে, রূপকণাকে তুই বিয়ে করতে পারিস?

—তুই যত বলেছিস, তার অর্ধেক সত্য হলেও ঐ মেয়েকে যে কেউ মাথায় করে রাখবে।

—তুই রাজী কিনা বল।

হো হো করে হেসে উঠে অতীন রায়।

—আগে তোর নিজের মনকে প্রশ্ন কর। তারপর দালালী করতে আসিস।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত চেপে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

ফিরবার পথে সিনেমার কাহিনীই অনেকটা পথ জুড়ে থাকে। তারপর ১৬ নম্বর সি.সি.এস্.।

সি.সি.এস. কোথায় যাচ্ছে জানেন মাত্র কর্নেল ক্রপার এবং মেজর এস্কুইথ। অতীন জানে, পিছনে নয়—সামনে। কক্সবাজার পেরিয়ে। কাল সমস্তদিন বোঝাই হবে স্পেশাল ট্রেন। রাত নটায় পার্সোনেলরা মার্চ করবে ট্রেনে।

এখানকার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভার নিচ্ছে ৪৮ নম্বর আই.জি.এইচ. (ইণ্ডিয়ান জেনারেল হাসপাতাল)। তাঁবু ফেলেছে ময়নামতীর পাহাড়ের আড়ালে। কুমিল্লা থেকে দাউদকান্দির পথে চার মাইল। সি.সি.এস্.-এর সমস্ত রোগী স্থানান্তরিত হয়েছে সেখানে। এবার থেকে জাহাজের সঙ্গে আই.জি.এইচ.-এর সংযোগ। সি.সি.এস্.-এর তত্ত্বাবধানে শেষ দল রোগী যাচ্ছে কাল। মোট সাড়ে চারশো রোগী। তার মধ্যে শতাধিক যুদ্ধাহত।

যুদ্ধাহতদের চলাচলের গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে সর্বস্তরে। সেজন্যই ফোনে পরিসংখ্যান দেন নি মেজর এস্কুইথ। আজ শেষ রাত্রে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে চাটগাঁ থেকে। কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে পৌঁছাবে কুমিল্লায়। স্টেশন থেকে গোটা পঁচিশ অ্যাম্বুলেন্সে দাউদকান্দির অন্ধকার পথে পৌঁছাবে জাহাজে।

রোগীরা আসবে সমস্ত দিনের অভুক্ত। জাহাজে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে আহার।

পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সি.সি.এস্. থেকে বিদায় নেয় প্রদ্যুম্ন। যেন একটা ঝড় বইছে। তছনছ হয়ে গেছে গোছানো সংসার। মোটঘাট সমেত

গোটা সি.সি.এস্-টাকে যেন অগাস্থা শীটের ছাউনি ব্যারাক থেকে রাস্তায় তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি মানুষ অন্তমনস্ক। চিন্তান্বিত।

তবু বিদায়ের ক্ষণে হাসে অতীন রায়।

—ভাগ্যকে পারানি করে তরী ভাসালাম। তীরে ডুববে, না ভরাডুবি হবে, কে জানে।

—এত নৈরাশ্যবাদী হোস্ন। শেষ পর্যন্ত দেখবি সব ভয় অমূলক।

—একটা রূপকথাও যদি থাকতো, ট্রেঞ্চের অন্ধকারে বসে রাত জাগবার সময় তার মুখ ভেবে সান্ত্বনা পেতাম।—হাসে অতীন রায়। কিন্তু এক বিমর্ষ মলিনতায় চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

অতীন রায়ও চলে গেল। এতক্ষণে হয়ত তাদের মাল বোঝাই হচ্ছে স্পেশাল ট্রেনে। রান্নার পালা শেষ হয়েছে টমি-কুকারে। রাত নটায় সমস্ত পার্সোনেল মার্চ করবে স্টেশনাভিমুখে। শুরু হবে অনিশ্চিত পথে যাত্রা।

আকাশে শেষ সূর্যের রশ্মি! ট্রাক চলেছে দ্রুতবেগে। ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপুনি লাগাচ্ছে হাড়ে। চান্দিনা থানা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা। পৌষের শুষ্ক ধূলি টায়ারের বেগে উড়ে এসে আপাদমস্তক ঢেকে দিচ্ছে। দূরে গ্রামের কোল ঘেঁষে কুয়াশার নীলাভ আস্তরণ। মনটা যেন নিজের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। কে জানে ফিরবে কিনা অতীন রায়। তার বিষণ্ণ হাসিটা যেন চোখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাঁচটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। রোগীরা আসবে সাতটায়। পথশ্রমে ক্লান্ত একদল ক্ষুধার্ত মানুষ। রান্নার পাট শেষ করতে হবে তার আগেই।

মাইল-মিটারে চল্লিশোর্ধ্ব বেগ। এবড়ো-খেবড়ো মেটে রাস্তায় ঝাঁকানি দিয়ে নেচে উঠছে গাড়িখানা। ড্রাইভারের সতর্ক দৃষ্টি রাস্তায়। প্রদ্যুম্নর উদাস দৃষ্টি আকাশে।

লার্ক জাহাজ ঘাটে নেই। আধ মাইল দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সুইফ্‌ট্ জাহাজের উপরের ডেকে গানের আসর বসেছে। বাসদেও খঞ্জনি সংগ্রহ করে এনেছে জাহাজীদের কাছে থেকে। রামফের তাল ঠুকছে রেশন-টিনে। কুমায়ুনী লোকনৃত্যের ছন্দে দুলছে প্রতাপ সিংয়ের দেহ। আনন্দ-উল্লাসে সবাই

তন্ময়। জেটির মুখে এসে ট্রাক দাঁড়াল—ভ্রূক্ষেপ নেই। বার দুই হর্ন বাজাতেই সব চুপ। প্রতাপ সিংয়ের হাঁক শোনা গেল।

—ফেটিগকে নিয়ে সব জলদী চলো।

খবরটা প্রথম বাসদেওর মুখ থেকেই শুনতে পেল প্রত্যুম্ন। দশটার সময় অপর একজন ক্যাপ্টেন এবং দুজন মাদ্রাজী নার্স সহ ফিরেছেন শ্রীকান্তন। সমস্ত পার্সোনেলদের সুইফটে পাঠিয়ে লার্কে চড়ে হাওয়া খাচ্ছেন চারজনায়।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধমক দিয়ে বাসদেওর মুখ বন্ধ করে প্রত্যুম্ন। রেশান উঠাবার হুল্লোড় শুরু হয়েছে।

উপরে আসে প্রত্যুম্ন।

বিছানায় নূতন চাদর দিয়েছে মহাবীর। ফিটফাট টান করে পাতা। কোথা থেকে কিছু গাঁদাফুল তুলে এনে গ্লাসে সাজিয়ে রেখেছে বেডসাইড টেবিলের উপর। সযত্ন মমতা যেন ঢেলে রেখেছে ঘরখানায়। বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে।

মহাবীর এসে দোরে দাঁড়ায়। স্মিত হাসি। নিজের কৃতিত্বের গর্বিত আনন্দ।

—বালিশ তুলুন। চিঠি পাবেন।

পথে আসতে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় হাত-পা কুঁকড়ে গেছে। সমস্ত দেহ ধুলায় ধূসরিত। নোংরা ক্লিন্নতা।

—এক কাপ চা খাওয়াবি মহাবীর ?

—নিশ্চয়। —চলে যায় মহাবীর।

ধীরে ধীরে আকাশ কালো হয়ে উঠছে। দূরের গ্রাম অন্ধকারের অতলে ডুবে গেছে। ঘাটনলের খালের জলে কুয়াশা। ভোঁস্-ভোঁস্ শব্দে ফিরে আসছে এস্.এস্. লার্ক।

কেশবের চিঠি।

এখানে আসার পর কেশবের এই দ্বিতীয় পত্র। আগের চিঠিতে অনাথবাবুদের কথা লেখে নি। প্রত্যুম্নও সংকোচে সে সংবাদ চায় নি। এবার গোড়াতেই অনাথবাবুর সংবাদ।

অনাথবাবু ইহলোকে নেই। শরীর সারিয়ে নেবার জন্য এক মাসের ছুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু তা মঞ্জুর হবার আগেই, সর্বোচ্চতম মালিকের কাছ থেকে ছুটির হুকুম পেয়ে গেছেন।

বাল্‌বের আলো যেন ঝাপসা হয়ে আসে। অক্ষরগুলো আর দেখা যায় না। হৃদ্‌পিণ্ডের উঠানামা নিজের কানেই শুনতে পায় প্রত্যুম্ন। এতবড় শার্ক জাহাজটা খালের জলে শব্দায়িত আলোড়ন তুলে সুইফ্‌টের পাশে ভিড়লো তার শব্দও এখানে পৌঁছায় না। চোখ বুজে সে শুয়ে পড়ে।

মহাবীর চা নিয়ে আসে।

—বাবুর্চি রেশান চাইছে—

—চাবি নিয়ে যা।

—ভীষণ শীত, চা এক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—হুঁ।

আলোটা নিবিয়ে দেয় প্রত্যুম্ন। বেড-সাইড টেবিলের উপর চা ঠাণ্ডা হয়। চোখ বুজে সে শুয়ে থাকে।

বাইরে থেকে দরজায় অবিরাম ধাক্কা পড়ছে। আলো জ্বেলে দোর খুলে দেয়।

মহাবীরের চোখ দুটি সন্ত্রস্ত।

—শীগ্‌গির উঠুন, বাবুজী। সি.সি.এস্‌-এর মেজর সাহাব এসেছে। কি ঠুকছে সাহেবকে।

—কেন?

—গড়গড় করে ইঞ্জিরিতে কি বলছে, আমরা মুখ্যু মানুষ বুঝব কেমন করে!

মোটর-অ্যাম্বুলেন্সের হেড-লাইট এবং জাহাজের কার্বন-লাইটে সমস্ত জেটি আলোয় উদ্ভাসিত। সি.সি.এস.-এর স্ট্রেচারবাহীরা দ্রুতগতিতে উপরের ডেকে চালান দিচ্ছে শয্যাশায়ী রোগীদের। নীচে নেমে এলো প্রত্যুম্ন। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মেজর এস্‌কুইথ।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে ভীষণ মাথা ধরেছে। একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

বিশ্বাস করলেন না।—এদিকে এসো।

দু কদম এগিয়ে গেল প্রত্যুম্ন।

—মুখ খোল—জোরে হাই দাও।

অদ্ধেকটা নাক যেন মুখের মধ্যে পুরে দিলেন এস্‌কুইথ। পরক্ষণেই টেনে নিলেন।

—অতিরিক্ত সিগারেট খাও।

প্রত্যুম্ন জবাব দেয় না।

—কম খেয়ো। বুড়ো বয়সটা ভুগবে।

শাসন নয়। কিন্তু কণ্ঠে লেশমাত্র প্রীতি নেই।

—কি আশ্চর্য মানুষ শ্রীকান্তন! জাহাজে এতগুলো সাঙ্ঘাতিক রোগী আসছে আর মদ খেয়ে চুর হয়ে আছেন।

—আমার কাছে কোনো নূতন ঘটনা নয়, স্যার—

—তাই দেখছি। দু-একটা হতভাগা রাত্রেই হয়ত শেষ হবে। কেউ খোঁজও নেবে না।

—সকালবেলা আমি ঠিক খবর পাব, স্যার। হয়ত একটা চাদরও ইস্যু করতে হবে।

—তোমার কি ঠাট্টা মনে হচ্ছে, হাবিলদার?—রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মেজর এস্‌কুইথ।

—অপরাধ নেবেন না, স্যার। একটা মানুষ মরবে, ফৌজে দরদ নিয়ে কে ভেবেছে?

মেজর এস্‌কুইথ জবাব দেন না। চোখ দুটি অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। তাকিয়ে রইলেন দূরে। জেটির উপর দিয়ে।

সবসুদ্ধ সাতান্নজন যুদ্ধাহত। একজনের গোটা পা নেই। কয়েক জনের হাতের অংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে মোড়া দশ-বারো জন। অনেকের দেহে একাধিক ক্ষত। ডজন দেড়েকের ক্ষত মারাত্মক নয়। কায়ক্লেশে চলাফেরা করতে পারে। বাকী সব শয্যাশায়ী।

বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। ক্যাপ্টেন শ্রীকান্তন জেটির এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করছেন। কি করছেন তিনি নিজেও জানেন না। দেহ তরল পদার্থে উত্তপ্ত। শীতের বালাই নেই।

স্ট্রেচার-কেসগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর হু-হু করে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এলো ওয়াকিং পেশেণ্টরা। প্রতি দশজনে একটা কিট আছে কি নেই।

মোটর-অ্যাম্বুলেন্সগুলোর এঞ্জিন একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। সদলবলে চলে গেলেন মেজর এস্‌কুইথ। নার্সদ্বয় এবং অভ্যাগত ক্যাপ্টেন সাহেব কোন ফাঁকে সরে পড়েছে। হয়ত কোনো একটা অ্যাম্বুলেন্সেই।

রাত নটায় জাহাজ ভাসলো দাউদকান্দি ছেড়ে। উত্তরে হাওয়া জোরে বইছে। জাহাজের চাল থেকে ডেক অবধি মোটা ক্যানভাসে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা জাহাজখানা। কোথাও একটু ফাঁক পেলেই আসছে সূচের মতো তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া। অন্যবার প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে থাকতো পুরো কিট। শয্যাদ্রব্যের অপ্রতুলতা হতো না। এবার রোগী এসেছে যুদ্ধের সম্মুখবর্তী লাইন থেকে। কম্বল বিছানা কারো নেই। কিছু সংখ্যক ওয়াকিং পেশেণ্টের সঙ্গে আছে গ্রেট-কোট। বাকীদের সার্জের ব্যাটল-ড্রেস। অনেকের প্যাণ্ট-শার্ট বিশ্রীরকম ছিন্ন।

সাব-এরিয়া অর্ডার বা গেজেটে হপ্তা দুই আগে হুকুম হয়েছে। মাথা পিছু দুখানা কম্বল। হাসপাতাল-জাহাজে নীচে পাতবার একখানা নিয়ে তিনখানা। স্টকে চারশো গ্রাউণ্ড-শীট এবং সাড়ে তিনশোর একটাও বেশী কম্বল নেই। আর আছে শ'পাঁচ বেডশীট। প্রতি ফেরতায় ধোয়ানো চাদর দিয়ে ময়লাগুলো নিয়ে যায় সি.সি.এস্.। এখন থেকে দেবে আই.জি.এইচ.। এবারে কেউ দেয় নি।

শীতে কাঁপছে মানুষগুলো। জাহাজ ছাড়বার আগে থেকেই ভিড় করে রয়েছে ক্লোদিং-স্টোরের সামনে। গোটা স্টোর যেন ওরা লুঠ করে নেবে। ম্যাক্-কে, মহাবীর, রায়ধারী তিনজনে মিলেও দোর থেকে চাপ হঠাতে পারছে না। তার মধ্যেই বিতরণ করা হচ্ছে একটা গ্রাউণ্ড-শীট, একটা চাদর, একটা কম্বল। হরির-লুটের মতো হাত বাড়িয়ে যে পারছে নিয়ে নিচ্ছে। কে নিচ্ছে জানবার উপায় নেই। একবার না দুবার নিল, তাও না।

রাত্রি দশটা নাগাত একজন রোগীর মৃত্যু হল। দেহটা ঢাকা দেওয়া হল সাদা চাদরে। কম্বল দুখানা তক্ষুনি বিলি হয়ে গেল অপর দুজনের।

এগারোটায় নিদ্রার জন্য কেবিনে এল প্রদ্যুম্ন। সমস্ত দেহ ক্লান্ত। শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছে। সামনের গ্লাসপেন দিয়ে আকাশ আজ আর দেখা যায় না। খোলা ডেকের প্রান্তে ক্যানভাসের অবরোধ। সমস্ত দিনের কোলাহল-ব্যস্ততা স্নায়ুগুলোতে যেন ছুটাছুটি করছে।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না।

বর্তমানকে ভালো-না-লাগা অসন্তোষের মেঘ মনের উপর ছেয়ে আসে। তার চিরসঙ্গী শূন্যতাবোধ আবার হাত পা মেলে। এক করুণ অনুভূতি আজ সমস্ত

দিন যেন মনের এক কোণে মুখ গুঁজে আছে। তার ভেতর দিয়ে ভেসে ওঠে রূপকণার মুখখানা।

রেল-কোয়ার্টারের সঙ্কীর্ণ ঘরখানায় হয়ত তার চোখেও ঘুম নেই। কাঁদছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার পথের ভয়ে মূহ্যমান।

গ্লাসপেনের ওধারে একখানা সাদা মুখ। দোরে ধাক্কা দিচ্ছে। বিরক্তিতে গা জ্বলে যায়।

—কি চাই?

লোকটাও কি যেন বললে। নীরন্ধ্র কেবিনের অভ্যন্তরে তার কণ্ঠস্বর একবিন্দুও এলো না।

না, লোকটা যাবে না। দরজা খোলে প্রত্যুম্ন।

—কি চাই?

—ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে বড্ড হাওয়া আসছে। একটা কম্বল দিতে পারেন?

—কম্বল নেই। অন্য কোথাও গিয়ে শোও।

—সমস্ত জাহাজে দুটো পা ফেলবার জায়গাও নেই।

—তাহলে ওখানে গিয়েই শোও।

—ঠাণ্ডায় জমে যাব যে!

—তাই যেও।—সকালে আমি চাদরে ঢেকে দিয়ে আসব।

—আপনার কি মায়া হয় না। আমিও একটা মানুষ—

—প্রত্যেকেই মানুষ। সাড়ে চারশো লোককে মায়া করবার ক্ষমতা আমার নেই।

—ইচ্ছে করলেই আমাকে একটু দয়া করতে পারেন।

—যেমন?

—আপনার কেবিনে হাওয়া আসে না। যদি অনুমতি দেন মেঝেতে আমি শুতে পারি।

—তাই শোও।

গ্রাউণ্ড-শীট নেই। একটা চাদর, একটা কম্বল। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে কেবিনের পার্টিশানে ঠেস দিয়ে সে বসে।

—চাদরটা বিছিয়ে শুয়ে পড় না কেন?

—কম্বলটায় বেজায় ধুলো, তাই চাদরে মুড়ে নিয়েছি।

—তোমার কি অসুখ ?

—ম্যালেরিয়া।

মারাত্মক রোগ নয়। প্রদ্যুম্নর তিনটে কম্বল। একটা নীচে ফেলে দেয়।

—তোমার কম্বলটা নীচে পেতে এটা গায়ে দাও।

লোকটার নাম এ্যাটকিন্সন। বিছানা পেতে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শোয়। ঘুমের সব আমেজটুকুই যেন শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট ধরায় প্রদ্যুম্ন।

—কিছু মনে যদি না কর, দেশলাইটা নীচে ফেলে দেবে সার্জেণ্ট ?

এ্যাটকিন্সন সিগারেট ধরায়। মিনিটখানেক কেউ কথা বলে না।

—তুমি কি বিয়ে করেছ সার্জেণ্ট ?

—বিয়ে করলে কি মরতে আসতাম ?

—আমি তো বিয়ে করেছি। তবু আমাকে আসতে হল।

—তোমার না এসে উপায় ছিল না।

—বিবাহিত লোকের পক্ষে যুদ্ধে আসা কি মর্মান্তিক, তুমি হয়ত ভাবতে পার না।

—কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

এ্যাটকিন্সন নিঃশব্দে সিগারেটে দু-তিনটে টান দেয়।

—এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে বলতে পার সার্জেণ্ট ?

—তোমার দেশের সরকারকে জিজ্ঞেস করে পাঠাও না।

—তোমার আমার মতো সাধারণ লোকের কথা সরকার কখনও ভাবে না। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলেও তাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই।

কথাটা সত্যি। এতে প্রতিবাদ চলে না। তেমনি ব্যঙ্গ করতেও চায় না। প্রদ্যুম্ন চুপ থাকে।

—আজ পাঁচমাস আমার স্ত্রী আর মেয়েটার খবর নেই। কাল সকালে ফটো দেখাব। কি সুন্দর তুলতুলে আমার মেয়ের মুখখানা।

—ওয়ার-অফিসে লেখ নি কেন ?

—তারা নির্বাক। একজন আত্মীয়কে লিখেছিলাম। বাড়ির নম্বরও দিয়েছিলাম। সে জবাব দিয়েছে। লিখেছে, কোনোরকমে তোমার বাড়ির রাস্তায় গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু বাড়িটার খোঁজ পাওয়া সম্ভব হল না। অথচ

সে লোক আজীবন লণ্ডনে থাকে। আমার বাড়িতেও কয়েকবার গেছে। এর অর্থ কি বলতে পার?

—জানি নে। তবে খুব আশ্চর্য।

—আমার কি মনে হয় জান? বাড়িটা বোমায় চুরমার হয়ে গেছে।

—তোমার অনুমান মাত্র। কোনো ভিত্তি নেই।

—ঈস্ট-এণ্ডের একটি ছেলে হালে ইনস্‌কিলিন ফিউজিলিয়ার্স এসেছে। সে বললে, ও-তল্লাটের অনেকগুলো বাড়ি বোমায় ধসে পড়েছে।

—কোনো নিশ্চিত সংবাদ ছাড়া কেন গুজব কথায় কান দিচ্ছ?

—এমন তো হতে পারে, বোমায় তারাও গেছে।

এ্যাটকিনসনের গলা ধরে আসে।

—কতকগুলো অশুভ অনুমান করে নিজের মনকে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

এক মিনিট চুপ করে থাকে এ্যাটকিন্‌সন। আবার বলে—ইরিনাকে তুমি দেখ নি। এমন স্ত্রী হয় না। আর দেড় বছরের ফ্রেন একটুকরো আনন্দের ফোয়ারা। এরা বেঁচে না থাকলে আমার বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না।

—নিরাশাবাদী কখনও হতে নেই, এ্যাটকিন্‌সন।

—তোমার কি মনে হয় তারা বেঁচে আছে?

—আমার বিশ্বাস তারা নিশ্চয় বেঁচে আছে। বাজে চিন্তা না করে ঘুমোও।

এ্যাটকিন্‌সন মাথার উপর দিয়ে কম্বলটা টেনে দেয়। তার ঘুম আসে কিনা বোঝা যায় না।

মাথার উপর পর্যন্ত প্রদ্যুম্নও কম্বল টেনে দেয়।

শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারে মন নিঃশব্দে জেগে থাকে। বিচিত্র অনুভব নিয়ে আসে। এক অন্তহীন অজ্ঞাত পথে তারা যেন ভেসে চলেছে আবাল্যের চিরপরিচিত পৃথিবী দূরে সরে যাচ্ছে। অস্পষ্ট অতীতের অন্ধকারে। ইঞ্জিনের ভোস ভোস শব্দে নদীর জল ভেঙে জাহাজটাও চলছে।

তবু চলবে এই যুদ্ধ। ব্যর্থ জীবনের আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুর পানে মার্চ করবে অতীন রায়। হারিয়ে যাবে ইরিনারা। ভেঙে যাবে মানুষের স্বপ্ন। আর রূপকণা! সুন্দর সংসার!

এ্যাম্বুলেন্স ট্রেন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। গোয়ালন্দর বদলে রোগী নামবে সিরাজগঞ্জ।

নল খাগড়ার বন আর বিস্তীর্ণ বালুচরের মাঝখান দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সংকীর্ণ খাড়ি। আগু পিছু এগিয়ে যাচ্ছে সুইফট্ ও লার্ক। ত্রিপাল দিয়ে মোড়া।

অন্ধকার রাত্রি। উত্তরে বাতাসের বেগ সমস্ত দিনে কমে নি। প্রচণ্ড শীত। এস. এস. সুইফট-এর ডেকে প্রায় শতাধিক বৃটিশ সৈন্য। সন্ধ্যায় ডিনার খেয়ে কম্বলের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। নিস্তব্ধ। প্রোপেলারের পাখায় জল ভাঙ্গার গর্জন। ইঞ্জিনের আর্তনাদ। আকাশ দেখা যায় না। জলের উপর গুড়ি মেরে বসেছে চাপ চাপ কুয়াশা। সেই আবরণ ভেদ করে সার্চ-লাইটের তীব্র কার্বন আলো বেশীদূর এগুতে পারছে না। জাহাজের গতি শ্লথ। আড়কাঠির সঙ্কেত খুঁজে সন্তর্পণে চলেছে। নীচে একজন লস্কর জলে অনবরত লগি ফেলছে আর সুর করে চেঁচাচ্ছে—হানি হাইলাম না—হানি হাইলাম না—হাতো হানি—

গতরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বক বক করেছিল এ্যাটকিনশন। আজ সন্ধ্যা থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিশ্রী আওয়াজে তার নাক ডাকছে।

সমস্ত দিন উপর-নীচ ছুটাছুটি চেঁচামেচি করে প্রদ্যুম্নও ক্লান্ত। তবু নিদ্রা কাছ ঘেষে না। অনাথবাবুর মৃত্যুসংবাদ কেমন যেন অভিভূত করে রেখেছে। দাউদকান্দি ছেড়ে আসা অবধি কেশবের চিঠিখানা জামার পকেট থেকে বের করে অনেকবার পড়েছে। চিঠিতে সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এমন কি মৃত্যুর কারণও বিশদভাবে জানায় নি।

চোখ বুজতেই একখানা মুখ মনের চোখে বারে বারে ভেসে ওঠে। রূপকণার। যেন সে কাঁদছে। অঝোরে কাঁদছে। পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ঢেউ-খেলানো কালো চুল। দিশেহারা সে।

গভীর সমবেদনায় রূপকণার দুঃখকে যেন সে নাগাল পেতে চায়। তার সহায়হীনতাকে সস্নেহে লাঘব করতে ইচ্ছে করে।

চোখে ঘুম আসে না। অতীন রায়ের কথাগুলো মনে পড়ে।

অতীন রায় বলেছিল, মেয়েটা তোকে ভালোবাসে। জাহাজ সিরাজগঞ্জ গেলে ঘুরে আসিস।

জাহাজ সিরাজগঞ্জ যাচ্ছে। এই দুঃসময়ে রূপকণাকে সান্ত্বনা দেবার, ভরসা

শোনাবার নৈতিক দায়িত্ব যেন তার ওপর পড়েছে। এই মুহূর্তে এরূপ একজনকেই রূপকথার একান্ত প্রয়োজন।

সকালবেলা জাহাজ নোঙর ফেলে সিরাজগঞ্জে।

সিঁড়ি লাগানো হয়েছে। রোগীরা নেমে যাচ্ছে। রোদ-পিঠ করে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকান্তন।

শ্রীকান্তন শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। কয়লা নিয়ে জাহাজ বিকেলের আগে ছাড়বে না। ব্রহ্মপুত্র পদ্মার ভাটি বেয়ে দাউদ্‌কান্দি আড়াই দিনের পথ। একটা রাত এবং পরবর্তী দিনমান পার্বতীপুরে কাটিয়ে জাহাজ দাউদকান্দি পৌঁছাবার আগেই ট্রেনে সে কুমিল্লা ফিরতে পারবে।

হ্যাভারস্যাকে এক প্রস্থ পরিধেয় এবং একটা কম্বল নিয়ে প্রত্যুম্ন এ্যাম্বুলেন্স ট্রেনে উঠে বসে। এতে সময় অনেকটা বাঁচবে। ঈশ্বরদিতে গাড়ি বদল করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পার্বতীপুর পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

হাসপাতালের সেই পুরানো তাবু।

শৈলেন কেশব লাঞ্চের বিরাম শেষে সবে অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আশ্চর্য হল উভয়েই। হাসি মুখে স্বাগত জানালে। শৈলেনের মুখে ঈর্ষাপীড়িত তিক্ত গাম্ভীর্য নেই। তবু বিষণ্ণতায় ছায়া। হাসলো—কিন্তু চোখ দুটি অন্যমনস্ক।

তার চারপাইখানা এখনও শূন্য। নূতন লোক আসে নি।

কেশব ও শৈলেন অফিসে চলে গেল। লঙরখানা থেকে আহার্য দিয়ে গেল। ব্যবস্থা করেছে কেশব।

খেয়ে শুয়ে পড়ে প্রত্যুম্ন। গত দুরাত সুনিদ্রা হয় নি। পথ ভ্রমণে এবং মানসিক উত্তেজনায় শরীর অবসন্ন। সবে মাত্র তন্দ্রা জড়িয়ে এসেছে। ঘরে এলো শৈলেন।

—ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

—না।

—হঠাৎ এলি যে ?

—মনটা খারাপ লাগলো। যাবার দিন অনাথবাবু আমাকে একটা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলেন। সময় সুযোগ পেলে হয়ত কিছু করতে পারতাম।

—কোন বিষয়ে বোধহয় বলতে আপত্তি নেই।—হাসলো শৈলেন।

—একটা চিন্তাই তাঁর মাথায় সদা সর্বদা ঘুরে বেড়াতো। মেয়ের একটা পাত্র দেখে দিতে বলেছিলেন। তুই কিছু এগিয়েছিস।

শৈলেনের মুখ অন্ধকার হয়ে আসে। শুষ্ক কণ্ঠে বলে—না।

—একটা ছেলে আমার মনে ধরেছিল। সে এখন মাংডোয়। তিনিও চলে গেলেন।

শৈলেনের কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠলো। কিছু যেন ভাবছে। বললে—কিছু মনে করিস নে বোস, রূপকণার প্রতি তোর কি কোনো দুর্বলতাই ছিল না?

—ও কথা কারোকে জিজ্ঞেস করতে নেই। সাময়িক দুর্বলতা মানুষের একাধিকবার আসে। ভবিষ্যৎ তাকে মুক্তিও দেয়।

লজ্জিত হল শৈলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে—ওরা চলে গেছে।

—কোথায়?—

—বরিশাল জেলায় গ্রামের বাড়িতে। ইয়ার্ডেই অনাথবাবু অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। বাঁচবেন না সন্দেহ হয়েছিল। দেশে তাঁর ভাইকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। তিনি এলেন মৃত্যুর দুদিন বাদে। পাঁচ-সাতদিন থেকে এখানকার বিলি-ব্যবস্থা মিটিয়ে সবাইকে দেশে নিয়ে গেলেন।

—মেয়েটার ভাগ্য সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

—রূপকণা বিয়ে করবে না।

—কে বললে?

শৈলেনের মুখখানা আরও কালো হয়ে গেল। কুণ্ঠায় কি দুঃখে বলা যায় না।

—যাবার আগের দিন আমি তাকে বলেছিলাম। মাথা নিচু করে দাঁড়াল। বললে, না।—জিজ্ঞেস করলাম, কেন?—জবাব দিলে, বিয়ে করব না।

প্রদ্যুম্ন চুপ করে রইলো। মানুষের জীবনে এক একটা সময় আসে। যখন মন ব্যথাহত, বঞ্চিত—পার্থিব সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বৈরাগ্যে মন তখন ছুটি চায়। সেই একান্ত মুহূর্ত রূপকণার জীবনেও হয়ত উপস্থিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এইটাই জীবনের পথ নয়। শেষ কথা নয়। প্রদ্যুম্নের ভাবনাতেও সম-অনুভব আসে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস শৈলেনও চেপে রাখতে পারে না। উঠে দাঁড়ায় সে।

—তুই ঘুমো। বিকেলে আলাপ হবে।

আবার অফিসে চলে যায় শৈলেন।

ঘুমের মেজাজ নেই। এপাশ ওপাশ করে সময় কাটতে চায় না।

আরেকটা নূতন ব্যর্থতাবোধ শুরু হয়েছে। যাকে ভেবে এতটা পথ ছুটে আসা, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও এরূপ সম্ভাবনার কোনো আশ্বাস শুনতে পায় না।

সাড়ে পাঁচটা অবধি কেশব ও শৈলেনের অফিস। আরও ঘণ্টা দেড় তাঁবুতে একা কাটাতে হবে। স্টেশন থেকে ঘুরে আসবে ভেবে বেরিয়ে পড়ে প্রদ্যুম্ন।

হাসপাতাল গেট থেকে ডান দিকে স্টেশন। প্রদ্যুম্ন বাঁ দিকে ঘুরে যায়। ঐ পথেই অনাথবাবুর কোয়ার্টার। বাড়িটার আকর্ষণ যেন এখনও শেষ হয় নি।

গৃহ শূন্য। দরজায় তালা নেই। হয়ত তার প্রয়োজন বোধ করেন নি রেল-কর্তৃপক্ষ। ভিতরে ঢুকে যায় প্রদ্যুম্ন।

ভাঙা কানাস্ত্রা, ছেঁড়া কাগজ—নানা আবর্জনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বারান্দার শেষ কোণে সামান্য কয়লা ঘুঁটে জমা রয়েছে। দরজায় খড়িমাটির লেখা। দেওয়ালে ময়লা হাতের ছাপ। মানুষ এখান থেকে সদ্য সদ্য বাস উঠিয়ে চলে গেছে তার সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। তারা যেন অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। সেখান থেকে তাদের খুঁজে বের করাও দুঃসাধ্য।

শীতের সন্ধ্যা আসন্ন। আলো ম্লান। ঘরের অভ্যন্তর এখনও অন্ধকার হয়ে উঠে নি। সুমুখের ঘরটার মাঝখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন। এইটাই অনাথবাবুর শোবার ঘর। নিশ্চয় এ ঘরেই শেষ-শয্যা পেতেছিলেন। এবং এই ঘর থেকেই তিনি অতীতকালে চলে গেছেন।

ঘরটা সহসা পীড়াকর হয়ে উঠে। প্রচণ্ড এক শূন্যতা। প্রদ্যুম্ন বেরিয়ে আসে। যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে চলে। গতি শ্লথ। মন উদাসীন।

গেট পেরিয়ে হাসপাতালে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন মজুমদারের সঙ্গে দেখা। ভিতরে যাচ্ছেন মজুমদার। হাত তুলে ফৌজী কেতায় অভিবাদন জানায় প্রদ্যুম্ন।

—এখানে?

—জলে বাস আর ভালো লাগছে না। সিরাজগঞ্জ এসেছিলাম। ভাবলাম পুরানো বন্ধুদের দেখে যাই।

—না আর কোনো আকর্ষণ?

—এখানে আর কি আকর্ষণ থাকবে ?

—ঐ রেল-কোয়ার্টারে এখন আর কেউ নেই।

—শুনেছি।

এগিয়ে যাচ্ছেন। এক মিনিট চুপ থেকে বললেন, লোকটা মারা যেতো না। নিজের দোষে মারা গেছে।

—অতিরিক্ত খেটে শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছিলেন।

—ঠিক চিকিৎসা হলে তাতে কিছু হতো না। আমার চিকিৎসায় বেশ উপকার হচ্ছিল। জান কি ওরা ভীষণ অকৃতজ্ঞ। মেয়েটা তো যাচ্ছেতাই।

সত্যি ঘটনা প্রত্যুম্নর অজানা নয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করে না। চুপ করে যায়।

প্রত্যুম্নর মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ের প্রসঙ্গে আর এগোন না। দম নিয়ে বলেন—এমন একটা সিরিয়াস কেস, ডাকলে কিনা বাজারের হাতুড়ে চক্রবর্তী ডাক্তারকে। সে আগাগোড়া gastritis-এর চিকিৎসা করেছে। gastritis তার বরাবর ছিল, সেটাই আরেকবার hepafitis-এ টার্ন নিয়েছিল, আমি চিকিৎসা করে ভালো করলাম। এবারেও Coronic hepafitis—gastritis-এর চিকিৎসায় এমন কি কাজ দেবে।

—ওকথা ভেবে এখন আর কি লাভ।

—শৈলেন অবশ্য আমাকে বলেছিল। আমি যেতাম। কিন্তু মেয়েটার অশিষ্ট ব্যবহার কিছুতেই ভুলতে পারি নি। কোনোদিন পারবও না।

—আপনার ঐ ছোট্ট অভিমানটুকু একটা জীবনের চেয়েও বেশী দামী হয়ে গেল স্যার।

দু পাটি দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট দংশন করলেন ক্যাপ্টেন মজুমদার।

—ওরা যে রকম ব্যবহার করেছিল, সে রকম ফল পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন মজুমদারের কদর্য মনোবৃত্তি প্রত্যুম্ন সহ্য করতে পারে না। প্রতিবাদ করে।—পূজোর দিন রাত্রে রূপকণা আপনার রিক্সা থেকে কেন নেমে গিয়েছিল তা আমি জানি। সে কথা থাক। তার এতবড় ক্ষতিতেও আপনি খুশী হবেন সেটা কিছু নয়।

—সাট আপ! তুমি কুৎসা রটাচ্ছ আমার নামে। জান তোমাকে আমি এ্যারেস্ট করতে পারি।

—বোধহয় তার আইন নেই।

—তুমি অবৈধ ভাবে হাসপাতালে ঢুকেছো!

—আমার পরিচয়-পত্র আছে। বড় জোর ঢুকতে নিষেধ করতে পারেন।

—বেরিয়ে যাও। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

অভিবাদন করে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে প্রত্যুম্ন।

স্টেশনে উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঘরেই অনেকক্ষণ একলা বসে কাটায়। আলো জ্বালায় না। ঘৃণা ও অপমানে অন্তরে ঝড় বইছে। অথচ এর প্রতিকার নেই।

শীতের তীব্রতা বাড়ছে। দার্জিলিংয়ের অনতিদূরে এই শহরে শীতের দাপট বেশী। ফ্ল্যানেলের ফৌজী সার্ট শীত ঠেকাতে পারছে না। উঠে আর. টি. ও. অফিসের একজন সেপাইকে খোশামোদ করে কম্বল ও হ্যাভারস্যাকটা আনতে পাঠায়। একঘেয়ে গ্লানি থেকে মনটা চাঙ্গা করে শরীরটাকে উত্তপ্ত করে তুলতে কেলনারে ঢুকে এক পেগ হুইস্কি খেয়ে এসে আবার ওয়েটিং-রুমে বসে।

ওধারের প্ল্যাটফরমে ছোট্ট ভিড় জমেছে। নিষিদ্ধ গলি থেকে একজন মাতাল সৈনিককে ধরে এনেছে মিলিটারি পুলিশ। বেটন দিয়ে লোকটাকে জন্তুর মতো পিটাচ্ছে। কানফাটা আর্তনাদ। বাকী লোকগুলো তামাসা দেখছে। আনন্দে সোরগোল করছে।

কি নিষ্ঠুর!

মানবতার জন্য যুদ্ধ হচ্ছে।

কত নীচে নেমে গেছে মানুষ। আরও কত নীচে নেমে যাবে।

তার পর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

আগামী কালের সমাজ বহুদিন পর্যন্ত এর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

কিন্তু যারা হারিয়ে গেল তারা কি ফিরবে? ....